ভূমিকা

সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যবিচার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সমালোচনা প্রদীপ্ত করে তোলে সৃষ্টিকে। তাই কোন্ আদিকাল থেকে সাহিত্য সৃষ্টি যেমন অব্যাহতভাবে চলেছে, তেমনি সাহিত্যের আলোচনা এবং বিচারও স্তব্ধ হয়ে নেই। যদিও সাহিত্যের রস-উপভোগেই সহৃদয় পাঠকের আগ্রহ সর্বাধিক, তবু সেই উপভোগ ও পরিতৃপ্তির কারণ জানতে গিয়ে কাব্যসৃষ্টির উৎস, কবিমানসের স্বরূপ, কাব্যবস্তুর ভাব-ঐশ্বর্য ও আঙ্গিক-সৌন্দর্য অবধি সন্ধান না করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি রস-প্রমাতারা। এ শুধু জ্ঞান-কণ্ডূয়ন নয়, এ হলো রসচর্বণার মনন-ঋদ্ধ আনন্দ, অলংকারিকদের মতে যা অলৌকিক।

একদা প্লেটো, এরিস্টটল, ভরত, ভামহ, দণ্ডী, আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্তাচার্য প্রমুখ মনীষীরা সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণে এবং কাব্য, নাটকের রস ও রূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁদের বুদ্ধি ও বোধি নিয়োজিত করেছিলেন অপূর্ব নৈপুণ্য সহকারে। তারপর থেকে কত বিদগ্ধ রসবেত্তা সেই রস বিচার পদ্ধতিতে কত নতুনদৃষ্টি, নতুন চিন্তা, নতুনতত্ত্ব সংযোজন করে চলেছেন। যুগ প্রবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রকৃতি ও আন্তর-ধর্মের পরিবর্তন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সাহিত্য-বিচার পদ্ধতির পরিবর্তনও প্রত্যাশিত। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রবাহের মধ্যেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক কতগুলি সিদ্ধান্ত আদর্শরূপে (standard) গৃহীত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। অবশ্য সেগুলোর নানা অংশ নিয়ে এখনো বিতর্ক চলে, নতুন দৃষ্টির আলোকে তাদের পরখ করেও দেখা হয়, কিন্তু তাদের একেবারে খারিজ করা অসম্ভব। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে কৌতূহলী আগন্তুকরা সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে তবে অগ্রসর হন নতুন চিন্তার পথে। তাই তাঁদের কাছে সেগুলি সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে।'

আচার্য অতুলগুপ্ত প্রমুখ রসকোবিদগণ সেই কাজে যোগ্য পথিকৃতের ভূমিকা নিয়ে থাকলেও সাহিত্য সম্ভোগ ও বিচারের পদ্ধতি সাধারণ্যে উপস্থাপিত করার অবকাশ এখনো রয়েছে।

প্রীতিভাজন অধ্যাপক বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "সাহিত্যতত্ত্বের রূপরেখা" গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আনুপূর্বিক মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং তৃপ্তি পেয়েছি।

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা, অধ্যয়ন ও চিন্তার পরিধি সুবিস্তৃত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার রীতি পদ্ধতি তাঁর সম্যক অধিগত। সুতরাং উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়েই তিনি সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ থেকে সুরু করে ধ্বনিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ট্রাজেডী তত্ত্ব, মহাকাব্যস্বরূপ, ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্তগুলি যথোচিত বিশ্লেষণ সহকারে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। চিরন্তন সাহিত্য রসতত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাহিত্য ভাবনার আলোচনা যুক্ত করে পরিকল্পিত গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

এই গ্রন্থে সাহিত্য চিন্তার মৌল উপাদান এবং গুরুত্ব পূর্ণ বিচিত্র তত্ত্বগুলি তিনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন তা শুধু তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ফল নয়, বরং স্বকীয় চিন্তা ও অনুধ্যানের ফসল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এই যে তিনি তুলনামূলক আলোচনারীতিতে মূল সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিশ্লেষণকে উজ্জ্বলকরার জন্যে বাংলাকাব্য সাহিত্যের নানা উদ্ধৃতি-উদাহরণের আশ্রয় নিয়েছেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকেও যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। অবশ্য এসবই তাঁকে করতে হয়েছে গ্রন্থের পরিমিত পরিসরের মধ্যে। কেননা এটি সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থ নয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সাহিত্য অধীতীদের সাহিত্য জিজ্ঞাসার সহায়ক-গ্রন্থমাত্র। কাজেই এখানে সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে যাবতীয় বিতর্কিত মতবাদ ও যুক্তিজালের গ্রন্থি মোচন করে স্বীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপনায় তিনি যত্নবান হননি, তিনি চেয়েছেন সাহিত্যতত্ত্বের মূলবস্তু সমূহের সুস্পষ্ট ধারণা দিতে। আমি অধ্যাপক চট্টোপাধায়ের নিষ্ঠা, প্রযত্ন ও সুশৃঙ্খল আলোচনারীতির প্রশংসা করে বলবো,—গ্রন্থটি কেবল মাত্র ছাত্রপাঠ্য বলেই যেন চিহ্নিত করা না হয়, যেহেতু সাধারণ সাহিত্যতত্ত্ব-রসিকের কৌতূহল নিবৃত্তির উপাদানও এতে রয়েছে।

আমি এই লেখকের সারস্বত সিদ্ধি কামনা করি।

॥ কোচবিহার ॥

ডক্টর সুবোধ রঞ্জন রায় এম. এ., ডি. ফিল.,
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আচার্য
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়।
॥ কোচবিহার ॥

গ্রন্থকারের নিবেদন

সাহিত্য কি? রস কি? রসসৃষ্টির রহস্য কি? সাহিত্য কোন গুণে কালাতীত মহিমা লাভ করে? দুঃখজনক কাব্য আনন্দ দেয় কেন? সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার এবং পাঠকের সম্পর্ক কি? ভাব ও রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি? সাহিত্যে প্রকাশ ভঙ্গীর মূল্য কতটা? ইত্যাদি জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন ভারতবর্ষের এবং য়ুরোপের সাহিত্য রসিকেরা। তাঁদের বিচারের সূক্ষ্ম ন্যায়, উপলব্ধির গভীরতা, চিন্তার বিস্তার বিস্ময়কর। তাঁদের আলোচনা-প্রত্যালোচনার প্রণালী এবং ফলশ্রুতির সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সাম্মানিক স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে সাহিত্যতত্ত্ব পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত মূল গ্রন্থাবলী সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে রচিত হয়েছে। ফলে ভাষার বাধা বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করবার পথে অনতিক্রমনীয় না হলেও দুরতিক্রম্য নিশ্চয়ই। একে বিষয়বস্তু জটিল তাতে ভাষার বাধা যদি দুর্লঙ্ঘ্য হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা তার থেকে শতহস্ত ব্যবধান রক্ষা করে চলবে তা বলাই বাহুল্য। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মনীষী অধ্যাপকদের প্রসাদে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশী এবং বিদেশী সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। তাঁরা বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন, জিজ্ঞাসা উজ্জীবিত করেছেন। আমি তাঁদের দ্বারা প্রাণিত হয়ে, তাঁদেরই রিক্থ নিয়ে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছি। এই বিষয়ে আমি যাঁর কাছ থেকে যা নিয়েছি গ্রন্থের মধ্যেই তার উল্লেখ আছে। অধিকন্তু গ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছি। আমার পূর্বসূরীদের প্রণাম নিবেদন করছি।

গ্রন্থটি লিখবার সময় বিষয়বস্তু নির্বাচনে পাঠ্যসূচীর দিকে যেমন নজর রেখেছি তেমনি উপস্থাপনার কালে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মনে রেখেছি। তাই সাহিত্য-তত্ত্বের সর্বজন বিদিত গ্রাহ্য মতগুলো যতদূর সম্ভব পরিভাষা বর্জন করে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তত্ত্ব-বিচার বিশ্লেষণের পর উদাহরণ দিয়ে বিশদ করবার ক্ষেত্রে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাঠ্য গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছি। আমার বিশ্বাস এতে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় রসবাদের আলোচনায় যেখানেই সুযোগ এসেছে সেখানেই য়ুরোপীয় রসবেত্তাদের

চিন্তার সঙ্গে ভাবতীয় আলঙ্কারিকদের চিন্তার ঐক্য নির্দেশ করেছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্য মোটামুটি ভাবে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। সমালোচনা সাহিত্য তারই পাশাপাশি একই ভাবে গড়ে উঠেছে। উল্লিখিত ঐক্য নির্দেশের দ্বারা ভারতীয় আলঙ্কারিকদের রস মীমাংসার সার্বজনীনতা এবং যে কোনও সাহিত্যের রসবিচারে তাঁদের মতের প্রয়োগমূল্যকে ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তে মুদ্রিত করে দেওয়া আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের চবিতার্থতায় গ্রন্থের সার্থকতা নির্ভর করছে। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পেরেছি কিনা সে বিচার করবেন পাঠকেরা। একই উদ্দেশ্যে অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিকসের নির্বাচিত পাঠ্যাংশের আলোচনার প্রসঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য জিজ্ঞাসার নিগূঢ় ঐক্য নির্দেশ করেছি। অনৈক্য যে কিছু নেই তা নয়, তবে তা একান্ত বহিরাঙ্গিক, রসই হোল মূল কথা। তাই তার উপব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিনি। এছাড়াও সাহিত্যে রোম্যাণ্টিসিজম্, ক্লাসিসিজম্, আই-ডিয়ালিজম্, রিয়ালিজম্ ইত্যাদি মতবাদের আলোচনা করেছি এবং পরিশেষে রবীন্দ্রনাথেব সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ কবে তুলতে চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস এর ফলে সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকের মনে মোটামুটি সামগ্রিক ধারনা দানা বেঁধে উঠবে। আমার প্রয়াস সার্থক হয়েছে কিনা সে বিচার করবেন পাঠকেরা। পাঠকের চোখে ত্রুটি-বিচ্যুতি যা ধরা পড়বে তৎসম্পর্কে লেখককে অবহিত কবে গ্রন্থটির উৎকর্ষ বিধানের জন্য যথোপযুক্ত উপদেশ নির্দেশ দিলে খুশী হব।

পরিশেষে স্মরণ করি অগ্রজোপম শিক্ষাগুরু শ্রীরবি ঘোষকে। যিনি আমার সাহিত্য-বোধকে অসীম ধৈর্য ও স্নেহ-বাৎসল্যের দ্বারা উজ্জীবিত করেছেন, পরিপুষ্ট কবেছেন, পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিমার্জনা করেছেন এবং আলোচনা নির্দেশনার দ্বারা গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছেন। নিছক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গুরুঋণ পরিশোধ করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁর আশীর্বাদ আমার সারস্বত সাধনার পাথেয় হোক। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডকটর সুবোধ রঞ্জন রায় কলেজ গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সরবরাহ করে আমার প্রচেষ্টাকে কেবলমাত্র অনলস রাখেন নি, প্রয়োজনীয় নির্দেশনায় শুধুমাত্র উৎসাহিতই করেননি, নানা অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিটি আনুপূর্বিক পাঠ করে গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আমি তাঁর ছাত্রস্থানীয়। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। সহকর্মী অধ্যাপক সুকুমার দাস নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এত নিবিড় যে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বিদায় দিতে কুণ্ঠা বোধ করছি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ এবং সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নলিনীভূষণ দাশগুপ্তের সক্রিয় প্রচেষ্টা ব্যতীত গ্রন্থ প্রকাশনা কোনওমতে সম্ভব হোত না। তিনি খ্যাতনামা প্রকাশক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপন করে দিয়েছেন এবং গ্রন্থ-প্রকাশনা সম্ভব করেছেন। আমি এঁদের স্নেহধন্য। এঁদের সকলকে শ্রদ্ধাসিক্ত নমস্কার জানাচ্ছি। শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় সুশৃঙ্খলভাবে গ্রন্থটি প্রকাশ করে বন্ধুত্বের অকৃত্রিম স্বাক্ষর রেখেছেন। তাকে প্রীতি জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ
ও সান্ধ্যমহাবিদ্যালয়
॥ কোচবিহার ॥

ইতি
বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

॥ সূচী ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	ছাপা হয়েছে	হবে
১০	৭	ব্যতিক্রমে	উল্লেখে।
১০	৯	উল্লেখ-মাত্রেই	ব্যঞ্জনায়।
২১	২২	স্বাযাংশ্চর্বণাপযুক্তঃ	স্বাযাংশ্চর্বণাপ্রযুক্তঃ।
২৩	৮	বাসনানুগরাগ	বাসনানুরাগ-সুকুমার।
২৩	১২	কাব্য বর্ণিত	কাব্য ব্যঞ্জিত।
২৩	১৩	কাব্য বর্ণিত	কাব্য ব্যঞ্জিত।
৪৪	২৯	স্বকর্মফলভুক পুমান	স্বকর্মফলভুক্ পুমান্।
৪৬	৩	Dictin	Diction।
৫০	১৮	Mystry	Mystery।
৫৬	১৯	আকৃতি	প্রকৃতি।
৮৮	৭	Semplienty	Simplicity।
গ্রন্থপঞ্জী	১৬	Sence	Essence।
ঐ	২৩	Elliot	Eliot।
ঐ	২৬	Coltins	Collins।
ঐ	২৭	Elliot	Eliot।

॥ সাহিত্যের সংজ্ঞা ॥

সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশকল্পে-সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, সাহিত্য ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু যা এক মনের সঙ্গে অপরমনের সহিতত্ব প্রার্থনা করে, সাহিত্যকারের অনুভূতি উপলব্ধির সঙ্গে সহৃদয় পাঠক আপন অনুভূতি উপলব্ধির অভেদত্ব অনুভব করে। এই কারণে অপরের অনুভূতির সাহচর্য প্রয়োজন হয়। 'সহানুভূতি' শব্দটির ভিতরে তার ইঙ্গিত রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের তিনটি অংশ রয়েছে :—(ক) সাহিত্যিক (খ) তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য (গ) পাঠক। সাহিত্যিক একজন ব্যক্তি, সাহিত্য তাঁর সৃষ্টি আর পাঠক হলেন তাঁর চলমান এবং প্রবহমান সহমর্মী। পাঠক এক অর্থে প্রবহমান কাল—নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছেন দেশ থেকে দেশে। পাঠক দেশে এবং কালে সাহিত্যিক এবং তাঁর বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও তার উপলব্ধ জীবন সত্যের সঙ্গে তত্ত্ব এবং তথ্যের ঊর্ধ্বে উঠে আপন উপলব্ধির অভেদত্ব খুঁজে পান। অর্থাৎ সাহিত্যিকের উপলব্ধ জীবনবোধ পাঠকের জীবনবোধের নিগূঢ়তম গভীরতায় গলে এক হয়ে যায়—পাঠক আপন ব্যক্তি সত্তার গণ্ডি পেরিয়ে সাহিত্যে বিধৃত মানবতাব গভীরতম এবং বিস্তীর্ণতম সত্যের সঙ্গে মিশে যান। কাজেই সাহিত্য এবং পাঠক অনোন্যসাপেক্ষ এবং সাহিত্য উপলব্ধিতে তার স্থান নির্ণয়ে পাঠকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। এই কারণে বলা হয় সাহিত্য "সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী।" হৃদয়-সংবাদের বাহন চিত্রকলা, ভাস্কর্য শিল্পও হতে পারে। মূলতঃ সকল শিল্পেরই রসাবেদন আছে। এই ক্ষেত্রে দর্শক এবং পাঠকের দায়িত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাকেও শিল্পীর সঙ্গে তাদাত্ম্যপূর্ণ হতে হবে অর্থাৎ সহজ কথায় শিল্পীর সামীপ্য অর্জন করতে হবে। পাঠকের রসসংস্কারের দিকে নজর রেখে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন ;—

"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে
বর্ণনীয়তন্ময়ীভবন যোগ্যতা তেঽত্র হৃদয় সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।"

[কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশত যে পাঠকের মন স্বচ্ছতা লাভ করেছে, যিনি কাব্যবস্তুতে ব্যঞ্জিত.চিত্তবৃত্তির সঙ্গে নিজের চিত্তবৃত্তির অভেদত্ব অনুভব করতে পারেন তিনি সহৃদয়]

আমরা পূর্বেই বলেছি চিত্রকলা, ভাস্কর্য শিল্প ভাষায় রচিত শিল্প সব কিছুই শিল্প জগতের বাসিন্দা—রসের প্রকাশে, ভেদ কেবল প্রকরণের। আমরা বর্তমানে কেবলমাত্র ভাষায় রচিত শিল্পবস্তুর আলোচনার ভিতরে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

কবিশিল্পী তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেন বাক্যের সাহায্যে বা বিভিন্ন ভঙ্গির সাহায্যে। বাক্যে কি থাকে? শব্দ ও অর্থের সমষ্টি। শব্দ ও অর্থ অবিচ্ছেদ্য। যে কোনও বস্তুর জ্ঞান অনুমান বা প্রত্যক্ষ যে ভাবেই সিদ্ধ হোক না কেন তা শব্দ ও অর্থকে আশ্রয় করেই সিদ্ধ হয়। মহাকবি কালিদাসের—"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" কথাটির মধ্যেও শব্দ ও অর্থের অনোন্যসাপেক্ষতার ইঙ্গিত করা হয়েছে। শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক গূঢ় সম্পর্কের দিকটি আচার্য ভর্তৃহরি নির্দেশ করেছেন এইভাবে ;—

"ন সোহস্তি প্রত্যয়োলোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে ॥"—(বাক্যপদীয়)

[জগতে এমন কোনও বিজ্ঞান নেই যার মূলে শব্দ অনুস্যূত হয়ে নেই। সমস্ত জ্ঞানই শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়।]

এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে অনায়াসে আসতে পারি যে, জ্ঞানের প্রকাশক হোল শব্দ। শব্দ ও অর্থের পার্বতী পরমেশ্বর সম্পর্কের কথা য়ুরোপীয় সাহিত্য বেত্তারাও স্বীকার করেছেন। ক্রোচে তাঁর "The Essence of Aesthetics" গ্রন্থে বলেছেন ;—

"...a thought is not thought for us, unless it be possible to formulate it in words ,... we do not say that the words must necessarily be declaimed in a loud voice ... ; but it is certain that when a thought is really thought, when it has attained to the maturity of thought, the words run through our whole organism, soliciting the muscles of our mouth and ringing internally in our ears."

শব্দ ও অর্থের অবিবিক্ত সম্পর্কের কথা বোঝা গেল। এই বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। বলা যেতে পারে প্রাথমিক কথাটি হোল "শব্দার্থৌ শরীরম।" শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন তার সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে তেমন শব্দ ও অর্থের তুল্যস্কন্ধ রূপ বাক্যের চারুতা সম্পাদন করে। এখন প্রশ্ন হোল শব্দ ও অর্থই কি সাহিত্য? চারুবাক্যই কি সাহিত্য? আমরা বলব শব্দ ও অর্থ কোনটাই সাহিত্য নয়। কেননা

শব্দ ও অর্থ অবিভাজ্য। এদের একটির প্রাধান্য এবং অপ্রাধান্যের উপরে যথাক্রমে শ্রুতি এবং মননের মনোহারিতা প্রকাশ পায়। চারুবাক্য হলেই তা সাহিত্য হয় না। কারণ ইতিহাস-বিজ্ঞানাদি মানসকর্মেও (Intellectual activity) চারুবাক্যের ব্যবহার দুর্লভ নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে আর্ণল্ড টয়েনবীর ইতিহাস, বার্কের Impeachment of Warren Hastings, রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ব—পরিচয়" সাহিত্য-গুণোপেত হলেও এটি সাহিত্য নয়। সাহিত্য শব্দার্থের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। তবুও সাহিত্য এবং ইতিহাস বিজ্ঞানাদির মধ্যে গোড়া ঘেঁষা পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটা এইভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে। ইতিহাস বিজ্ঞানাদিতে শব্দার্থই মুখ্য এবং শেষকথা। সেখানে ঠিক কথার ঠিক মানেটি থাকা চাই। সেখানে যে বিচার ও যুক্তিতে তথ্যের ও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, তার পারম্পর্যের নীরন্ধ্র ধারণা এবং জ্ঞানকে অবিকৃত এবং স্বচ্ছভাবে পাঠক বা শ্রোতার মনে গেঁথে দেবার মত বাক্যরচনার কুশলতা থাকা চাই। সাহিত্যে শব্দার্থ মুখ্য বটে কিন্তু চরম নয়। সাহিত্যে শব্দার্থকে কেন্দ্র করে ব্যঞ্জনা আক্ষিপ্ত হবে—পাঠকের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে দেবে। সাহিত্যে থাকে চমৎকারিতা। "অলঙ্কার কৌস্তুভে" কবি কর্ণপুর জানিয়েছেন—"অসাধারণচমৎকারকারিণী রচনা হি নির্মিতিঃ।" রচনা কথাটির দ্বারা প্রাচীনেরা শয্যারচনা, বেণীবন্ধন, গ্রন্থন, ইত্যাদি সব কিছু বুঝিয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থে সংকুচিত করে নিয়েছেন, সেইটি হোল "অসাধারণ চমৎকারকারিণী।" কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেই কথাটি অর্থবান। এইখানেও শব্দ ও অর্থের গুণসাম্য থাকে। কিন্তু তা যান্ত্রিক নয়। এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। মোটের উপর কথাটি হোল এই যে কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ গুণসাম্য অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। এই কারণে আচার্য কুন্তক জানিয়েছেন,—

"সম সবগুণৌ সন্তৌ সুহৃদাবিব সঙ্গতৌ।
পরস্পরস্য শোভায়ৈ শব্দার্থৌ ভবতো যথা।"

[সব দিক থেকে সমান গুণবিশিষ্ট সুহৃদ যেমন পরস্পরের শোভাবর্দ্ধন বা চমৎকারিত্ব বিধান করে তেমনি (কাব্যেও) সমান গুণবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থ পরস্পরের সৌন্দর্য বিধান করে]

আমরা আবার স্মরণ করছি যে শব্দ চমৎকৃতি বা অর্থ চমৎকৃতি কোনও একটির দিকে ঝোঁক যে কাব্যে পড়ে সেই কাব্য উঁচুস্তরের নয়। মহৎ সৃষ্টিতে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে অন্যূনানতিরিক্ততা সব সময় রক্ষিত হবে। উদাহরণ হিসেবে জয়দেবের

'গীত গোবিন্দ', ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ম এবং কালিদাসের মেঘদূত, শকুন্তলা, বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমোক্ত কবি দুইজনের কাব্যে যথাক্রমে শব্দ-চমৎকৃতি এবং অর্থ-চমৎকৃতি রয়েছে এবং শেষের দুইজনের কাব্যে শব্দার্থের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে। শব্দ এবং অর্থের সৌহৃদ্য থেকে 'সাহিত্য' সজ্ঞার উৎপত্তি। তাই আচার্য কুন্তক 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে পুনরায় বলেছেন ,—

"সাহিত্যমনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাঽপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ॥"

[সৌন্দর্যবিধানের ক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থের পরস্পর অনুকূল গুণসাম্যই 'সাহিত্য'। এখানে শব্দ ও অর্থের অন্যূনাতিরিক্ত মনোহারিতা অটুট থাকে।

কাব্য সাহিত্যে শব্দ বা অর্থের প্রাধান্যভেদে শব্দকাব্য. ধ্বনিকাব্য, রসকাব্য ইত্যাদি শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। ঐ আলোচনা পরে করব।

শব্দ ও অর্থের সৌহৃদ্যের দিক থেকে সাহিত্যের সংজ্ঞা আমরা আলোচনা করেছি। এবারে আরেক দিক থেকে সাহিত্যের সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি বিচার করব। আলোচ্য বিষয়ের প্রারম্ভিক সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে, কবি সাহিত্যিক কোনও দৃশ্য ঘটনা বা শ্রুত ঘটনা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাকে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় বাণীবদ্ধ করেন। বাণীবদ্ধ করবার বিশেষ কৌশলের ফলে কবি শিল্পীর স্বোপলব্ধ অনুভূতি সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়—সহৃদয়ের হৃদয় সংবেদ্য হয়ে উঠে। এইভাবে কবি বিষয়বস্তু এবং সহৃদয়ের মধ্যে ভাবসাম্য ঘটে। এই সংযোগ হোল 'সাহিত্য'। কবিকর্মের বা সৃষ্টির সার্থকতা এইখানে। এইবারে একটি উদাহরণ সাহায্যে বিষয়টা বোঝা যাক। সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা ধরা যাক। হ্যামলেট এই প্রথম হোরেসিওর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে তাঁর পিতার প্রেতাত্মা দুর্গের মধ্যে এসেছিলেন। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমালায় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জেনে নিয়ে হ্যামলেট বলে উঠলেন,—

"Hamlet :—I would I had been there,
Horatio :—It would have much amaz'd you.
Hamlet :—Very like, very like. Stay'd it long,"

(Hamlet ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

কবি এখানে নায়কের চিত্তবৃত্তিতে ডুব দিয়েছেন এবং নায়কেরই ভাষায়—তাকে প্রকাশ করে অপরের হৃদয়-সংবেদ্য করেছেন। তাই এইটে সাহিত্য হয়েছে। এই

কারণে আলঙ্কারিক বলেছেন,—"নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ।" নায়ক নায়িকার চিত্তবৃত্তির সঙ্গে কবি সামীপ্য অনুভব করেন এবং সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে পাঠকের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেন। পাশ্চাত্য সমালোচকদেরও এই ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। লেসলী এ্যাবারক্রোম্বি "Principles of Literary Criticism" গ্রন্থে বলেছেন,—

"We have seen that every work of literature originates in an experience. It may be any sort of experience. Some thing may have happened to the author in actual life or he may have heard a story of something or some phantasy may have flashed into his mind. But it must be an experience peculiar in one respect, it must be of a kind to take hold of him and to demand utterance. There might be nothing extraordinary in an experience that merely urged him to express himself, there must be something extraordinary in any experience that urges him to express himself to perfection, and in a way that will also represent his experience to another mind." এর পরে তিনি সেক্সপীয়ারের কাব্য প্রেরণার উৎস এবং তার রূপায়ণের কথা বলেছেন। এই সূত্রে তিনি শব্দার্থ যোজনার কৃতিত্বের দ্বারা নায়ক, কবি এবং সহৃদয়ের চিত্তের ভাবসাম্যের কথা বলেছেন।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি কবি শিল্পীর স্বোপলব্ধ অনুভূতি ভাষায় সমর্পিত হয়ে কায়া ধারণ করে যে শিল্প বস্তুটি গড়ে উঠে তাই কবি বিষয়বস্তু এবং পাঠকের মধ্যে যোগসেতু রচনা করে। ভাবের রূপসৃষ্টি কবিকর্ম। অর্থাৎ কোনও abstract idea বা ভাববস্তুকে শব্দার্থে সমর্পণ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা ;—নিরাকারকে সাকার করে তোলা, ভাবের অনুরূপ দেহ নির্মাণ হোল সৃষ্টি। একে বলা হয় ভাবের সহিত ভাষার সারূপ্য সাধন। সহজ কথায় বলা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞতা যে আবেগ অনুভূতি কবিচিত্তে উপচিত হয় তার সার্থক অভিব্যক্তির সূত্রে সাধারণীকৃতি ঘটলে তাকে বলি সাহিত্য। আধুনিক কবি সমালোচক টি. এস. এলিয়টের সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। তিনি "On poety and poets" গ্রন্থের "The social function of poetry" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন,—"poetry has primarily to do with the expression of feeling and emotion ; and that feeling and emotion are particular, whereas thought is general."

প্রকাশের সাফল্যের উপর সাহিত্যের সহিতত্ব নির্ভর করে। প্রকাশ সাফল্য আবার নির্ভর করে শব্দার্থ যোজনার কৃতিত্বের উপর। দেহ-বিচ্ছিন্ন আত্মার উপলব্ধি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি শব্দার্থরূপী শরীর নিরপেক্ষ কাব্যাত্মা অনুপলভ্য। কাজেই "হৃদয়ে দেখি কিন্তু দেখাতে পারিনা" দলের যাঁরা তাঁরা হলেন 'হৃদয় কবি', ক্রোচে তাঁদের বলেন "impotent poets।" আবার প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁদের ছন্দপতন ঘটে তাঁরাও উচুদরের স্রষ্টা নন। এই কারণে ভট্টতৌত বলেছেন,—"নোদিতা কবিতা লোকে যাবজ্জাতা ন বর্ণনা।" এই ধরণের বক্তব্য টি. এস. এলিয়টের পূর্ব উল্লিখিত প্রবন্ধে পরিবেশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,—"...his (poet) direct duty is to his language, first to preserve, and second to extend and improve" আবার সার্থক শিল্পীর সঙ্গে অপরের পার্থক্য নির্দেশ করে দিয়েছেন এইভাবে,—

"That is the difference between the writer who is eccentric or mad and the genuine poet. The former may have feelings which are unique but which cannot be shared, and are therefore useless; the latter discovers new variations of sensibility which can be appreciated by others।" একেই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—"দর্শনাদ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।" কাজেই রূপ সৃষ্টির প্রাথমিক সর্ত শব্দ ও অর্থের সৌহৃদ্য। কাব্য বিচারের Starting point হোল এইটে।

এই ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শব্দ, অর্থ, রূপরীতি ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদি অন্যোন্যসাপেক্ষতায় বিধৃত হলেও এদের সামবায়িক রূপ সাহিত্য নয়। এরা সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান মাত্র, এরা যে যার সামর্থ্যানুযায়ী রস সৃষ্টির পরিপোষণা করে। ঐ রসই কাব্যের আত্মা। রসের যোগে আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগ অনুভব করি। ঐ যোগ উপলব্ধি সাহিত্য। এতৎ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ক্রমে করব।

॥ বাগর্থের প্রকারভেদ ॥

কবি শিল্পীর কাজ সহৃদয়ের চিত্তে রস সঞ্চার করা। রসের সঞ্চার বা উদ্বোধন উপায় নিরপেক্ষ ভাবে হয় না। শব্দ ও অর্থ হোল সেই উপায় যার আশ্রয়ে কবি রসের উদ্বোধন করেন। এই কারণে আমাদের আলঙ্কারিকেরা বলেন,—

"আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায় তয়া তদ্বদর্থে বাচো তদাদৃতঃ॥"
[ধ্বন্যালোক, ১।৯]

[আলোকপ্রার্থককে যেমন দীপশিখার পরিচর্যা করতে হয় তেমনি (কবি শিল্পীকে) রসসৃষ্টির নিমিত্ত শব্দার্থময় কথাবস্তুর যত্ন নিতে হয়] এইজন্যে শব্দের শক্তি বা বৃত্তি বলে তার অর্থ প্রকাশক রূপটিকে ঠিক মত চিনে নিতে হয়। শব্দের শক্তি বা বৃত্তি তিনটি,—(ক) অভিধা, (খ) লক্ষণা, (গ) ব্যঞ্জনা। আমরা ঐ তিনটি বৃত্তির স্বরূপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব।

অভিধা :—শব্দের আভিধানিক অর্থ বা বাচ্যার্থ যে বৃত্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে বলে অভিধা। অভিধা বৃত্তিতে শব্দটি হোল বাচক এবং অর্থটি বাচ্য বা মুখ্য। আচার্য মম্মট বলেছেন,—"সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং যোঽর্থম্ অভিধত্তে স বাচকঃ।" বাচ্যবাচক সম্পর্কটি হোল যান্ত্রিক। এই অর্থে সীমাবদ্ধ। যেমন বলা যেতে পারে,—"মাঠ হইতে গরুটি আন"—এই বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-গুলো স্ব স্ব অভিধা শক্তি বলে আপন বাচ্যার্থ প্রকাশ করবার পরে সমন্বিত ভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে তদনুযায়ী কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত তার দৌড়। এই হোল শব্দের সাক্ষাৎ সংকেতিত অর্থ। এখানে দেখা যাচ্ছে মাঠ থেকে গরুটি আনবার যে নির্দেশ বাক্যটিতে বুঝিয়েছে এর বেশি কোনও অর্থ দ্যোতনা ঐ বাক্যটিতে নেই। একেই বলেছি অভিধেয় অর্থ। এর বৃত্তি হোল অভিধা।

লক্ষণা :—শব্দের অভিধাবৃত্তির দ্বারা কোনও বাক্যের বা বাক্যাংশের সাক্ষাৎ বা সরাসরি অর্থবোধে যখন ব্যাঘাত ঘটে অর্থাৎ আভিধানিক অর্থের দ্বারা বাক্য বা বাক্যাংশের সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ করা যায় না তখন মুখ্য অর্থের পাশ কাটিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ গৌণ অর্থের অনুসন্ধান করতে হয়। শব্দের গৌণ অর্থকে দ্যোতিত করবার ক্ষমতাকে

বলা হয় লক্ষণা। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক,—"এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ কৈলে ফলত সোনা"—শব্দের মুখ্যার্থের দ্বারা এর অর্থ করা যায় না। সোনার মুখ্যার্থ হোল মহার্ঘ ধাতুবিশেষ। ধাতু অর্থে কথাটিকে ধরলে অর্থ করা যায় না। কাজেই গৌণ অর্থের দ্বারস্থ হতে হোল। সোনা ঐশ্বর্যের প্রতীক—সমৃদ্ধির প্রতীক। এই অর্থের দ্যোতনায় পাওয়া গেল, মানুষের জীবনক্ষেত্র পতিত না রেখে, যথার্থ কর্ষণ করলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত—ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। সোনা এখানে ধাতুরূপ পরিহার করে মহার্ঘতার সূত্রে নবতর অর্থদ্যোতনা করেছে। একেই বলেছি লক্ষণা। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে বাচ্যার্থের চাইতে লক্ষ্যার্থ উঁচুদরের হলেও তা সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। লক্ষণা অভিধার মতোই ব্যঞ্জনার সহকারী।

ব্যঞ্জনা ঃ—আমরা লক্ষ্য করেছি অভিধা এবং লক্ষণার শক্তি সীমিত। তারা আপন আপন শক্তি বলে বাক্যার্থ প্রকাশের শেষ সীমায় পৌঁছবার পরেও বাক্যার্থ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না। তখন যে বৃত্তির বলে শব্দ নতুন অর্থ পরিগ্রহ করে—তাকে বলে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি। ব্যঞ্জনা শক্তি বলে প্রকাশিত অর্থকে বলে ব্যঙ্গ্যার্থ; ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশক শব্দকে বলে ব্যঞ্জক। ব্যঙ্গ্যার্থ যান্ত্রিক নয়। সহৃদয়ের স্বাধীন কল্পনায় তার যথার্থ রূপ অভিব্যঞ্জিত হয়। ধ্বনি সম্পর্কে আচার্য আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন,—

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥"

[ধ্বন্যালোক ১।৪]

[মহাকবিদের বাণীতে দেহাতিরিক্ত এমন একটি বস্তু থাকে যা শব্দ অর্থ, রীতিকে ছাড়িয়ে যায়, এইটে অঙ্গনাদের লাবণ্যের মত কাব্যদেহে ঝলমল করতে থাকে।] ঐ অতিরিক্ত বস্তুকে বলা হয়েছে ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনার ভিত্তি হোল বাচ্যার্থ, সহায়ক লক্ষণা।

এইবারে একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টা বিশ্লেষণ করা যাক,—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

উদ্ধৃত বাক্যাংশের বাচ্যার্থ হোল, হে সখি আমার দুঃখের সীমা নেই, ভরা বর্ষাকাল, ভাদ্র মাস, আমার গৃহ শূন্য। এই বাচ্যার্থ কাব্যোপলব্ধি ঘটাতে পারে না। কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক থেকে বিচার করলে বর্ষার ঘনান্ধকারে মিলনোৎসুক বিরহিনীর আর্তস্বর শোনা যাবে। বর্ষার ধারাবর্ষণে স্থিতিহীন, নিয়ন্ত্রণাতীত মন প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মদনার্ত প্রহর গুণছে। কবি কল্পনায় বিরহিনী রাধার বেদনাকে পরতে পরতে মেলে ধরে আমাদের চেতনায় নিতান্ত আত্মীয়ের দাবিতে গেঁথে দিয়েছেন। একের বেদনা সকলের হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে বচনাতীতের জগতে আমাদের মনকে উত্তীর্ণ করে দেয়। শব্দের এই বৃত্তিকে বলে ধ্বনি। ধ্বনি সহৃদয়ের চিত্তে রসরূপে উদ্ভাসিত হয়। সে আলোচনা যথাস্থানে করব।

শব্দের অর্থ প্রকাশ শক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের উপর ভিত্তি করে আরও দুইটি মতবাদ গড়ে উঠেছে—(ক) অভিহিতান্বয়বাদ (খ) অন্বিতাভিধান বাদ। এই দুইটি মতবাদ সম্পর্কে আমরা সামান্য আলোচনা করে নেব।

(ক) **অভিহিতান্বয়বাদ**:—আমরা দেখেছি প্রতিটি শব্দের একটি স্বতন্ত্র অর্থ আছে। একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসক্তির দ্বারা স্বতন্ত্র শব্দগুলো বিধৃত হয়ে নিজের ভিতরে একটি অন্বয় সাধিত করে; ফলে অখণ্ড অর্থবোধ ঘটায়। অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত পদগুলো স্ব স্ব বাচ্যার্থ প্রকাশ করে তদনন্তর সমন্বিত অর্থ প্রকাশ করে। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে, প্রবন্ধ লেখবার ক্ষেত্রে এর মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

(খ) **অন্বিতাভিধানবাদ**:—এই মতবাদে বলা হয়েছে বাক্যান্তর্গত পদগুলো আদৌ সমন্বিত অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত পদগুলো স্বতন্ত্র ভাবে কোনও অর্থ প্রকাশ না করে পরস্পরের অন্বয় সাধনের ভিতর দিয়ে অখণ্ড অর্থ প্রতীতি জন্মায়। শব্দের অর্থ এখানে বিশেষভাবে অন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। কারও মতে অন্বয় নিছক বাক্যগত নয়—এর মূল রয়েছে জাতির ঐতিহ্য সংস্কারের ভিতরে, যে পরিবেশের ভিতর থেকে কথাগুলো জেগে উঠে তার সঙ্গে মিলিয়ে কথার অর্থ করতে হয়। একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক,—*

*অন্বিতাভিধান বাদ বাক্যগত অন্বয়কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অন্বয়কে ব্যাপক অর্থে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ দাশগুপ্তের 'শিল্পলিপি' গ্রন্থের "অভিহিতান্বয়বাদ বনাম অন্বিতাভিধান বাদ শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

"আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যায় অন্ধকার হইয়া যাইবে; কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না।......ওড় কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।"

(পথের পাঁচালী)

এই উদ্ধৃতাংশের অর্থ তখনই হৃদয় সংবেদ্য হয়ে উঠে যখনই "সন্ধ্যায় সাঁঝ জ্বালা" প্রকৃতির সঙ্গে অপুর আত্মীয়তার ভাবানুষঙ্গে অন্বিত করে দেখি। সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার সঙ্গে জাতিগত ঐতিহ্যের যোগ রয়েছে, সেইটির ব্যতিক্রমে বিষাদস্পৃষ্ট সন্ধ্যার রাত্রির মৌন গভীরে আত্মাবলুপ্তির উল্লেখ মাত্রেই আমাদের সত্তা আলোড়িত হয়ে উঠে। আমরা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ চকিত হয়ে উঠি। অভিহিতান্বয়বাদের সূত্রের প্রয়োগ করলে ঐ অখণ্ড অর্থপ্রতীতি জন্মাবে না। য়ুরোপীয় পাঠকের সঙ্গে তুলসীতলে সন্ধ্যাবাতির কোনও ভাবানুষঙ্গ জড়িত নেই। তাই উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের পূর্ণ আস্বাদন তার পক্ষে সম্ভবে না। সৃষ্টিমূলক রচনার ক্ষেত্রে ঝোঁকটা অন্বিতাবিধানবাদের দিকে পড়বে।

॥ রসতত্ত্ব ॥

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় এইটে পরিষ্কার হয়েছে যে কাব্য-সাহিত্যের অভিব্যক্তি ঘটে শব্দার্থকে আশ্রয় করে। শব্দার্থ হোল কাব্যের দেহ। শব্দার্থকে Starting point ধরে কাব্যাত্মার অনুসন্ধান করেছেন আমাদের আলঙ্কারিকেরা। তাঁরা এটাও স্বীকার করেছেন যে অখণ্ড এক অলৌকিক আনন্দানুভব কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি। এই আনন্দানুভূতিই হোল রস এবং রস অনুভব সাক্ষিক। রস কাব্যের আত্মা, এইটে তাঁরা প্রমাণ করেছেন অন্বয় ব্যতিরেকে ন্যায়ের পথ ধরে। শব্দার্থ হোল যাত্রাপথের Starting point। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন,—"শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োহবয়ব সংস্থান বিশেষবৎ, অলঙ্কারাঃ হি কটককুণ্ডলাদিবৎ ইতি।"

[শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর, রসাদি তার আত্মা, (ওজঃপ্রসাদ ইত্যাদি) গুণাবলী শৌর্যের ন্যায়, দোষসমূহ (অনৌচিত্য ইত্যাদি) খঞ্জের ন্যায়, রীতি সমূহ অঙ্গ সংস্থানের ন্যায় এবং অলঙ্কারাদি কটক কুণ্ডলের সদৃশ] —সাহিত্য দর্পণ

এখন বিচার্য হোল কাব্য কি? লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই কাব্যের প্রাথমিক পরিচয় বাক্য বা বাক্যরাশি। বাক্যে আছে অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি এবং ঐ অর্থ গড়ে উঠেছে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিকে ভিত্তি করে। শব্দার্থ হোল কাব্যের প্রকৃষ্ট Objective fact। কাব্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে শব্দার্থ জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু সেইটে সব নয়। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি। নিছক বাচ্যার্থ, যার সঙ্গে শব্দের যোগ একান্তভাবে যান্ত্রিক তা কখনও রসকে ব্যক্ত করতে পারে না। তা যদি পারত তাহলে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এমন কি দৈনন্দিন হাটবাজারের দেনা-পাওনার কথা সব কিছু কাব্যের পর্যায়ভুক্ত হোত। আমরা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝি ওগুলো কাব্য নয়। কাজেই সিদ্ধান্ত হোল এই যে শব্দার্থ কাব্য নয়।

আচার্য ভামহ, দণ্ডী-প্রমুখ অলঙ্কারবাদীরা বললেন কাব্যানন্দের উৎস হোল উপমা-রূপকাদি অলঙ্কারসমূহ। বাক্যের অলঙ্কৃতিজনিত সৌন্দর্যানুভব কাব্যানন্দের মূল কারণ। আচার্য দণ্ডী তাই বলেছেন,—"কাব্য শোভাকরান্ ধর্মান অলঙ্কারাণ্ প্রচক্ষতে।" কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে বাক্য অলঙ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তা কাব্য হয় নি, পক্ষান্তরে নিরলঙ্কৃত বাক্যও কাব্যমহিমা লাভ করেছে; আবার এর বিপরীত কথাও সত্য। অলঙ্কৃত বাক্য কাব্য, স্বীকার করলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, আবার নিরলঙ্কৃত বাক্য কাব্য নয় স্বীকার করলে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। আসলে অলঙ্কার বাক্যকে চারুত্ব দান করে অলঙ্করণ হোল "beautifying instrument।" উপযুক্ত দোষ পরিহার করবার জন্য বক্রোক্তি জীবিতকার আচার্য কুন্তক বললেন, বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি অর্থাৎ কেবলমাত্র শব্দার্থ নয় বক্রোক্তিযুক্ত শব্দার্থ হোল কাব্যের আত্মা। তিনি বললেন, লোক ব্যবহারে ইতিহাস-বিজ্ঞানে প্রয়োজনের সহজ কথা থাকে, কাব্যে থাকে অপ্রয়োজনের লীলা-ভঙ্গিমা; তার মূলে রয়েছে বক্তব্য প্রকাশের একটি বিশেষ ধরণ বা ঢঙ। দেখা যাচ্ছে তিনি Style এর দিকে ঝুঁকেছেন। সে কথায় পরে আসছি। তিনি আরও দেখালেন অলঙ্কার বক্রোক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাহিত্যে এমন নজীর রয়েছে যে বক্রোক্তি কাব্যের স্তরে উন্নীত হয় নি অথচ নিরলঙ্কৃত সহজ বাক্য কাব্যের জগতে ছাড়পত্র পেয়েছে। এবারে দুইটি উদাহরণ নিয়ে বক্তব্য সমর্থন করা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন,—"সভ্যতার তিনটি স্তর আছে—শ্রুতি, দর্শন ও বিজ্ঞান। আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়, আমরা আর যেখানেই থাকি না কেন, মধ্যযুগে নেই। কারণ আমরা চোখে কিছু দেখি না, হয় সব শুনি নয় সব জানি।

সুধীজন বিচার করবেন আমরা আদিমযুগে আছি না সর্বাধুনিক যুগে আছি।" —এই বক্রোক্তি কাব্য নয়, এর আবেদন মার্জিত বুদ্ধির কাছে, হৃদয়ে নয়, অথচ আমরা জানি কাব্য হৃদয়-সংবেদ্য। আবার বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,—"সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে আর আমি কোথায় ?" মেহেরুন্নিসার এই অনলঙ্কৃত সহজ বাক্যে যে কাব্যসৌন্দর্য রয়েছে তার তুলনা মেলে না। আমরা মুহূর্তের মধ্যে মেহেরুন্নিসার চাপা ব্যথার সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ি। এই পঙক্তি কাব্য হয়েছে। কাজেই অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি দোষ ঢাকবার জন্য স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের উল্লেখ হয়ে থাকে। এইটে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে অলঙ্করণ এবং অলঙ্কার্য অভিন্ন হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতিরেকেও বলা যায় যে, কাব্যাত্মা কাব্যদেহের সঙ্গে অভিন্ন, সে সকলকে নিয়ে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে অলঙ্কার অভিন্ন নয়। একটি বাক্যকে প্রকাশ করবার বৈচিত্র্যভেদে অলঙ্কারভেদ ঘটে। উদাহরণ দিয়ে তা দেখান যেতে পারে,—'মুখটি খুব সুন্দর' এই বাক্যটিকে প্রকাশভঙ্গীর গুণে বিচিত্র অলঙ্কারসৃষ্টি করা যেতে পারে, যেমন, "মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর" "মুখটি যেন চন্দ্র" "ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র" "মুখটি চন্দ্রের চাইতেও সুন্দর" এই ভাবে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কার সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই সিদ্ধান্ত হোল অলঙ্কার প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবেই কাব্যের আত্মা বলে গণ্য হতে পারে না। বক্রোক্তি নামান্তরেও নয়।

রীতি :—আমরা দেখলাম অলঙ্কার কাব্যের আত্মা নয়। অলঙ্কার বক্তব্যের সৌকর্যবিধান করে মাত্র, অলঙ্কার কাব্যের বাহ্য উপকরণ মাত্র। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন,—

"কাব্যের আর একটা দিক আছে সে তার শিল্পকলা।...'খুশি হয়েছি'· ·এই কথাকে সাজাতে হ'য় সুন্দর করে, মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসর ঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। ··যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয়, এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।" রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শিল্প-সৃষ্টি যেমন তেমন করে প্রকাশ নয়,—তার একটা কলাসম্মত রীতি আছে এবং ঐ রীতি কাব্য-সৃষ্টির সবটুকু নয়,—একটা অঙ্গমাত্র। পাশ্চাত্য সমালোচক কড্ওয়েল বলেছেন,—"All men under stimulus of the feelings become poets in some very small degree ··in a state of excitement they will have recourse to metaphors. similes, personifications and exaggeration.··· And as the effect of these emotions on the

ordinary man is to make him see pictures and speak in images, so it is with greater intensity on the artist···these have always been poetic forms of speech." কড্ওয়েলের বক্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে ফারাক্ কিছুই নেই। ভাবের গভীর আবেগ থেকে ("যা অত্যন্ত অনুভব করি"। "effect of these emotions") প্রকাশ্ভঙ্গিমায় কারুনৈপুণ্য বা poetic forms of speech" এর আশ্রয় নিতে হয় এবং এইটে অপৃথগযত্ননির্বত্য। মূলতঃ এখানে রীতির কথা বলা হয়েছে।

আমরা এও দেখেছি আলঙ্কারিকেরা বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতির উল্লেখমাত্রেই রীতির দিকে ঝুঁকেছেন। আচার্য বামন স্পষ্টই বললেন, "রীতিরাত্মা কাব্যস্য।" রীতি হোল বাক্‌নির্মিতির বিশিষ্ট ভঙ্গি বা Style। বাক্‌নির্মিতি ভাবের রূপনির্মাণ। ভাবের নিজস্ব কোনও রূপ নেই, শব্দেরও কোনও ভাব নেই। ভাবের স্পর্শে শব্দ ভাবময় হয়ে উঠে আবার শব্দের সহযোগে ভাব রূপময় হয়ে উঠে। ভাব ও শব্দের মিলনে রূপসৃষ্টি। এই মিলন সাধনের ক্ষমতা কমবেশি সকলেরই আছে, তৎসত্ত্বেও এইটে স্বীকার্য যে কবিশিল্পীর প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সাধারণের প্রকাশভঙ্গির তথা বাক্‌নির্মিতির বিলক্ষণ তফাৎ রয়েছে। রূপনির্মিতি অলঙ্কার তত্ত্বের অন্তর্গত।

দ্বিতীয়তঃ রীতির একটি আনুষঙ্গিক হোল 'গুণ'। এই গুন-সমূহ হোল, ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ, মাধুর্য ইত্যাদি। এইসব গুণাবলীর কোনও না কোনও একটির প্রকাশ কাব্যে ঘটে। এমন কি এইগুলো বক্তৃতা, প্রবন্ধেরও গুণ বটে। রীতি অলঙ্কারের ন্যায় শব্দার্থের বাহ্য উপকরণ নয়,—আভ্যন্তরীণ শক্তি বিশেষের অভিব্যক্তি। যেমন বলা যেতে পারে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় এবং রবীন্দ্রনাথের 'সুখ' কবিতায় যথাক্রমে ওজঃগুণ এবং মাধুর্য এবং প্রসাদ গুণের অভিব্যক্তি ঘটেছে। রীতিবাদীরা তাই রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন। কিন্তু আমরা জানি রীতি অলঙ্কার তত্ত্বের অন্তর্গত। গুণকে সুব্যক্ত করবার সহায়তা করে অলঙ্কার। অর্থাৎ অলঙ্করণ নৈপুণ্যের ফলে কোথাও মাধুর্য, কোথাও শ্লেষ, কোথাও মাধুর্য আভাসিত হয়। রীতি হোল Primary, অলঙ্করণ হোল Secondary ব্যাপার। রীতিকে আত্মা বলে স্বীকার করলে প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ইতিহাস, বিজ্ঞানকেও কাব্যের মর্যাদা দিতে হয়। এখানেও অতিব্যাপ্তি দোষ এসে পড়ে। কাজেই সিদ্ধান্ত হোল রীতি কাব্যের আত্মা নয়।

ধ্বনি :—বস্তুবাদী বিচারে আমাদের আলঙ্কারিকেরা পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কথা বলবার কৌশল তাঁদের বিভ্রান্ত করতে পারে নি। তাঁরা বললেন, রীতি অলঙ্কার-বিন্যাসের কারু কৌশল মাত্র। রীতি গুণ হতে পারে, কিন্তু আত্মা নয়।

রীতিকে বলা যেতে পারে আত্মার আনুষঙ্গিক। গুণকে আত্মা বলে স্বীকার্য করলে—"Putting the cart before the horse"—হয়। তাই তাঁরা বললেন কাব্যের আত্মা হোল ধ্বনি।

এখন প্রশ্ন হোল ধ্বনি বস্তুটি কি? সাহিত্য বেত্তারা শব্দার্থ বলতে শব্দ ও তার বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ নির্দেশ করেছেন। ধ্বনিবাদীরা বললেন শব্দের একটি তৃতীয় শক্তি আছে তার নাম ধ্বনি। এই ধ্বনি বস্তুটি কাব্যদেহ থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না তা জ্যামিতিক প্রমাণ-সাপেক্ষ নয়, বাচ্যার্থের মত স্পষ্ট নয়, বৈয়াকরণিক এবং আভিধানিক বুদ্ধির অধিগম্যও নয়। তবে কি? ধ্বনি কাব্য সংস্কার সম্পন্ন পাঠকের অনুভববেদ্য, বাক্যাতীত আনন্দ। ধ্বনির দ্বারাই বাচ্যাতিরিক্ত এক নতুন অর্থ অভিব্যঞ্জিত হয়। শব্দার্থ, রীতি, অলঙ্কার সব কিছুকে অধিগত করে এবং অতিক্রম করে অবস্থান করে ধ্বনি। সহৃদয় পাঠকের স্বাধীন কল্পনা পারম্পর্যে ধ্বনি গৃহীত হয়। সহজ কথায় বলা যেতে পারে কাব্যের বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরনের অভিব্যঞ্জনাকে বলে ধ্বনি। ঐ ব্যঞ্জিত অর্থের আলঙ্কারিক পরিচিতি ব্যঙ্গ আখ্যায় বা ব্যঙ্গার্থ নামে। ধ্বনিবাদীরা ঘোষণা করলেন যে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ হোল কাব্যের আত্মা।

ধ্বনিবাদের প্রবক্তা আচার্য আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কিত অভিমত আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে [ব্যঞ্জনা দ্রষ্টব্য] আলোচনা করেছি। পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ধ্বনিবাদীদের মৌল যুক্তি হোল ধ্বনি শব্দের সাক্ষাৎ সংকেতিত অর্থ নয়—কাব্যের বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনা। এই মূল সত স্বীকার করে নিয়ে বিরোধী-পক্ষীয়েরা নতুন তর্কের সূচনা করেছেন। তারা বলেন শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক যান্ত্রিক এবং সীমিত, ব্যঙ্গার্থ বাচ্যকে উপেক্ষা না করলেও তার সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়। তাই যদি হয় তবে কাব্যের তাৎপর্যবৃত্তিকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করতে বাধা কোথায়? ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। তাৎপর্য বৃত্তি শব্দের সাক্ষাৎ সংকেতিত অর্থ নয়। তবুও তা সীমিত তাৎপর্যার্থ নির্ণয়ে দুইটি রীতি আছে। একটি অভিহিতান্বয়-বাদ অপরটি অন্বিতাবিধান-বাদ। এই দুইটি সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। যদিও কাব্যের আনুষঙ্গিক অন্বিতাবিধানবাদ, তবুও তাৎপর্য বৃত্তি দিয়ে কাব্যের আত্মার সন্ধান মিলবে না।

নৈয়ায়িকেরা অনুমিতার্থের সাহায্যে কাব্যের আত্মাকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। এটাও যুক্তিসহ নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক,—"সকল মানুষ মরণশীল। রাজাও মানুষ।" এর অনুমিতার্থ হোল, যেহেতু মানুষ মাত্রেই মরণশীল এবং মানুষ হিসাবে রাজার সঙ্গে মানুষের সাধারণ ঐক্য আছে সেই হেতু রাজাও মরণশীল। শব্দের

সাক্ষাৎ সংকেতিত অর্থ না হওয়া সত্ত্বেও অনুমিতার্থ সীমিত। অথচ কাব্যানন্দ অসীম এবং অনুভূতিবেদ্য। তাই অনুমিতার্থ দিয়ে কাব্যের আত্মার স্বরূপ জানা যায় না। ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করতে হয়।

ধ্বনির প্রকারভেদ :—বাচ্যকে ভিত্তি করে ধ্বনি অনুরণিত হয়। তাই ধ্বনি সৃষ্টির উপায় হিসাবে শব্দার্থের যত্ন নিতে হয়। কেননা উপায় নিরপেক্ষভাবে রসের সঞ্চার হয় না। আচার্য আনন্দবর্দ্ধন উপমার সাহায্যে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। [পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, ব্যঞ্জনা দ্রষ্টব্য]। আচার্য সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন যে ব্যঙ্গার্থের আশ্রয়রূপে বাচ্যার্থের অপরিহার্যতা স্বীকার করলেও মনে রাখতে হবে যে, ব্যঙ্গার্থের উৎকর্ষে কাব্যের উৎকর্ষ। ব্যঞ্জনার উৎকর্ষাপকর্ষের ভিত্তিতে কাব্যের শ্রেণীভেদ নির্ণীত হয়েছে,—(ক) বস্তুধ্বনি। (খ) অলঙ্কার ধ্বনি। (গ) রসধ্বনি। এদের মধ্যে রসধ্বনি হোল শ্রেষ্ঠ।

(ক) **বস্তুধ্বনি :**—ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা যখন কোনও বস্তুর প্রতীতি জন্মায় অথচ বর্ণনায় সেই প্রতীত বস্তুর উল্লেখ থাকে না তখন তাকে বস্তুধ্বনি বলে। যেমন ধরা যাক,—

"·যনে তব, হে রাক্ষসপুরী
অশ্রুবিন্দু, মুক্ত কেশী-শোকাবেশে তুমি,
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ আভরণ, হে রাজ সুন্দরী
তোমার। ওঠ গো শোক পরিহরি, সখি"

এই কাব্যাংশে কবি শোক সন্তপ্ত লঙ্কাপুরীর বর্ণনা করেছেন। অচেতন রাজপুরীর উপর ক্রন্দনরতা, শোকসন্তপ্তা, সুন্দরী রাজমহিষীর ব্যবহার আরোপ করেছেন। শিল্প চাতুর্যের গুণে অপর বস্তুর প্রতীতি, যার উল্লেখ নেই, (শোক সন্তপ্তা রাজমহিষী) বিশেষণের, মাধ্যমে তা ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই অংশের ধ্বনি সুন্দরী রাজমহিষীর শোক বর্ণনায় সমারোপিত হয়েছে অন্য একটি বস্তু বর্ণনার সূত্রে। এর বাইরে একপদও অগ্রসর হয় নি। এই হল বস্তুধ্বনি।

অলঙ্কার ধ্বনি :—ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা যেখানে কোনও ব্যবহৃত অলঙ্কার বাক্যে অনুল্লিখিত কোনও অলঙ্কারের প্রতীতি জন্মায় সেখানে অলঙ্কার ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন ধরা যাক,—

"নারীর মুখে একি দেখিলাম !
নয়ন মাঝে অশ্রু টলমল ? কিম্বা কমল শিশির ঝলমল ?
চলিতে পথে চকিতে দাঁড়ালাম।"

এখানে বক্তব্য হোল অশ্রুসজল নারীর মুখ শিশিরসিক্ত কমলের মত। এই উপমাটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয় নি। সংশয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। একে বলা হয় সন্দেহালংকার। সুতরাং বাক্য হোল সন্দেহালংকার কিন্তু তার ব্যঞ্জনা হোল উপমা, যা কাব্যাংশে অনুল্লিখিত রয়েছে। এইটে কাব্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ নয়। ওর মাধুর্য ব্যঞ্জিত উপমার মধ্যে নেই—রয়েছে সংশয়ের ভিতরে। উপমাটি সংশয়ের পরিপুষ্টি বিধান করেছে। এবং তারই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এর বাইরে আসবার ক্ষমতা তার নেই। বর্ণনাকৌশলের গুণই মুখ্য হয়ে উঠেছে। একে বলা হয় অলঙ্কার ধ্বনি।

রসধ্বনি ঃ—ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলে যেখানে রতি, শোক, ইত্যাদি কোন স্থায়িভাবে প্রতীতি জন্মায় সেখানে রসধ্বনির সৃষ্টি হয়। রসধ্বনি যে কাব্যে প্রতীত হয় তাই শ্রেষ্ঠ কাব্য। যেমন,—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥"

এই কাব্যাংশে বাচ্যার্থকে ছাপিয়ে ব্যঞ্জনায় সাধারণীকৃত বিরহবাস্থার রতি সহৃদয় সামাজিক চিত্তে শৃঙ্গার রসরূপে ধ্বনিত হয়েছে। এখানে রতির আশ্রয় বিরহ-বেদনা-কাতর রাধিকা, আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ, উদ্দীপন বিভাব বর্ষাকাল, (ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য, মত্ত দাদুরীর কলরব, কুলিশ পাত, ডাহুকীর ডাক ,—সমগ্র কবিতাটি দ্রষ্টব্য) শূন্য গৃহ ব্যভিচারিভাব হোল স্মৃতি. আবেগ, বিষাদ। রস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। এইখানে এর কাব্যত্ব।

রসধ্বনি বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের একটু সতর্ক হয়ে অগ্রসর হতে হবে। কারণ হোল এই যে, স্থায়িভাবের চর্বণাত্মক আস্বাদনই রসধ্বনির মূল সর্ত। অর্থাৎ রসধ্বনি তখনই সৃষ্টি হয় যখন স্থায়িভাবের সাধারণীকৃতি ঘটে। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, স্থায়িভাবের প্রসঙ্গ নেই সঞ্চারিভাব বা ব্যাভিচারিভাব ধ্বনিত হয়ে কাব্যত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ ব্যভিচারিভাব নিজস্ব বিভাব, অনুভাবের সহায়তায় আস্বাদ্য হয়ে উঠে। একে বলা হয় ভাবধ্বনি। এই রকম কাব্যকে বলা হয় ভাবকাব্য। ব্যভিচারিভাব যেখানে স্থায়ীর পরতন্ত্র, সেখানে সৃষ্টি হয় রসধ্বনি। কাব্যকে বলা হয় রসকাব্য। আরও একটি ক্ষেত্রে ভাবকাব্য সৃষ্টি হতে পারে, সেইটি হোল রাজবিষয়ক স্তুতি এবং দেবতা বিষয়ক স্তুতি রচনায় ভক্তি প্রীতি, দৈন্য, হর্ষ, ইত্যাদি ভাব অভিব্যঞ্জিত হয়। শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকূতিতে ভক্তিভাব, মাতা-পুত্রের মানাভিমানে

বাৎসল্য ভাব ধ্বনিত হয়েছে আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে আত্মনিবেদন শীর্ষক পদে দৈন্য, আকুলতা, ভক্তি ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের সহায়তায় প্রীতি ভাব প্রধান ভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়ে ভাবধ্বনি সৃষ্টি করেছে। ইংরেজীর Song of the Psalms"ও এই জাতীয় কাব্য। সংস্কৃত কাব্য থেকে একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়,—

"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥"

এর বাচ্যার্থ হোল বিবাহের প্রস্তাবে পার্বতী লজ্জাবনত মুখে লীলাকমলের পত্রগণনা করতে লাগলেন। এখানে সঞ্চারিভাব হোল অবহিত্থা বা সলজ্জআনন্দানুভূতি অনুভাব নতমুখে পত্রগণনা, আলম্বন বিভাব নায়কের প্রসঙ্গ (অনুল্লিখিত রয়েছে) উদ্দীপন বিভাব বিবাহের প্রস্তাব। এই সকল বিভাব অনুভাবের সহায়তায় ব্যভিচারিভাব অবহিত্থা পরিপুষ্টি লাভ করেছে এবং পূর্বরাগের লজ্জাকে ব্যঞ্জিত করেছে। তাই সৃষ্টি হোল ভাবধ্বনি। আচার্য আনন্দবর্দ্ধন তাই বলছেন,—

"অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃত স্বরূপং···অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাব-লক্ষণং প্রকাশয়তি।"

[ধ্বন্যালোক, ২।২৩]

আমরা এখন সিদ্ধান্ত করতে পারি যে শ্রেষ্ঠ কাব্য রসপরতন্ত্র। সেখানে অলঙ্কার রীতি, ধ্বনি সব কিছু রসের অধীন। তাই ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেও আলঙ্কারিকেরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, রসের কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই করলেন এবং রসকে কাব্যের আত্মা বলে স্থির সিদ্ধান্ত করলেন।

ভাব ও রস :—ভরতমুনি রসসূত্রে বলেছেন,—"বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।" এই সূত্রের সরল অর্থ হোল বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারি-ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি ঘটে। দেখা যাচ্ছে রসনিষ্পত্তির পক্ষে কয়েকটি সর্ত আরোপিত করা হয়েছে। সর্তাবলী হোল বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাবের বিশেষ সংযোগ সাধন। আমরা ঐ বস্তুগুলো সম্পর্কে ধ্যানধারণা পরিচ্ছন্ন করে নেব।

ভাবকে সাধারণ কথায় বলা হয় Emotion বা Feeling। ভরতমুনি ভাবকে দুইভাগে ভাগ করেছেন,—(ক) স্থায়ী এবং (খ) সঞ্চারী। স্থায়িভাবের সংখ্যা

হোল আটটি কোনও কোনও অলঙ্কারিক নির্বেদকে স্থায়িভাবের অন্তর্গত করেছেন এবং তাঁদের মতে স্থায়িভাব হোল নয়টি। এই নয়টি স্থায়িভাব হোল,—রতি, ক্রোধ, ভয়, শোক, উৎসাহ, বিস্ময়, জুগুপ্সা, হাস, নির্বেদ। এই ভাবগুলোর আনুষঙ্গিক রস হোল যথাক্রমে,—শৃঙ্গার, রৌদ্র, ভয়ানক, করুণ, বীর, অদ্ভুত, বীভৎস, হাস্য এবং শান্ত। সঞ্চারি ভাব তেত্রিশটি,—গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চাপল্য, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স্বপ্ন, বিরোধ, মাৎসর্য, অবহিত্থা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, উন্মাদ, মরণ, এবং বিতর্ক; কোনও কোনও আচার্য 'নির্বেদ'কেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছো। স্থায়িভাবকে বলা হয় Permanent States of mind ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাবকে বলা হয় Transient States of mind। এই উভয়বিধ ভাবই প্রাক্তন সংস্কার রূপে সকলের ভিতরে আছে। এই কারণে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন,—"ন হ্যেতচ্চিত্তবৃত্তিবাসনাশূণ্যঃ প্রাণী ভবতি।" তবুও ঐ দুই ভাবের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ঐ পার্থক্য সম্পর্কে ভরতমুনি কিছু বলেন নি। আচার্য অভিনবগুপ্ত ঐ পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন,—সঞ্চারিভাব সমুচিত কারণ ব্যতিরেকে সামাজিকের চিত্তে উদ্ভূত হয় না এবং সেই কারণ অপগত হোলে সেই ভাব লুপ্ত হয়, এমন কি, অনভিব্যক্ত সংস্কার রূপেও চিত্তে অবস্থান করে না। কিন্তু স্থায়িভাব কখনও নিশ্চিহ্ন হয় না, তার অভিব্যক্তির প্রকারভেদ পাত্রভেদে ঘটতে পারে। সঞ্চারিভাব স্থায়িভাবের পরিজন সদৃশ। স্থায়িভাবের মর্যাদা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ভরতমুনি তাকে রাজা বলে অভিহিত করেছেন, শিষ্যসমাজে গুরুর তুল্য বলেছেন। ব্যভিচারিভাব হোল স্থায়ীর অনুচর মাত্র। স্থায়িভাবের রসত্বপ্রাপ্তির সহায়তা করে সঞ্চারিভাব, কিন্তু নিজেরা রসময় অভিব্যক্তি লাভ করে না—"স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ।"

পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্‌গণ ভাবের পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা ঐ দুটিকে Emotion এবং Sentiment নামে অভিহিত করেছেন। Emotion স্থায়ী সংস্কার, Sentiment সংস্কার বটে, কিন্তু উপযুক্ত কারণে তা জাগ্রত হয় এবং কারণ অপগত হলে তা লোপ পায়;—"It may be that the intensity of the belief-feeling is no criterion of the permanence of the disposition which it leaves behind. Many people who experience the most intense beliefs are also the most changeable and instable in their conviction." এবং লেখক আরও লক্ষ্য করেছেন,—As a rule···the belief or doubt feelings are very subtly interwoven with the other

emotions. We rarely believe strongly unless some emotion—it may be joy or fear, pride or humility is reinforcing the belief. And doubt, more evidently perhaps, is commonly dependent upon a prior clash of interests and a resultant emotion.···But if these intellectual feelings spring from other emotions they also give rise to them, since they modify so fundamentally the course of our responses.

[A. B. C. of Psychology, by, C. K. Ogden. P. 207]

এখানে belief অর্থে 'মতি' এবং doubt অর্থে 'বিতর্ক' ব্যভিচারিভাবকে বোঝানো হয়েছে।

স্থায়ী এবং সঞ্চারিভাবের উদ্বোধক কারণকে বলে বিভাব। বিভাব দুই রকমের, (ক) আলম্বন বিভাব। (খ) উদ্দীপন বিভাব। ইংরেজীতে বলে Emotion object এবং Inciting factor। নায়িকা হোল নায়কের আলম্বন বিভাব। ফুল, মালা, চন্দন, জ্যোৎস্না রাত্রি, বসন্ত ঋতু ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব হোল বিভাবের প্রতিক্রিয়াজাত জৈব-মানসিক অভিব্যক্তি। অর্থাৎ বাচনভঙ্গী, শারীর নিক্ষেপ, কটাক্ষ, অশ্রুবর্ষণ, স্মিতহাসি, হুঙ্কার, আর্তনাদ ইত্যাদির অভিব্যক্তি। এখন উদাহরণ যোগে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :—

"নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

"এ জন্মে নহে।" লুৎফউন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমিষ আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল ;···ললাটদেশে ধমনীসকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল ; জ্যোতির্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল ; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল।···উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।"

[কপালকুণ্ডলা, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

এই অংশের আলম্বন বিভাব নবকুমার, উদ্দীপন বিভাব নবকুমারের প্রত্যাখ্যান, সঞ্চারিভাব গর্ব, আবেগ, বিরোধ, মতি, অনুভাব "তীরবৎ" দাঁড়ানো, সদর্পভাষণ,

মস্তক উন্নত করণ, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী, চক্ষুঃ স্থাপন, ললাট দেশের ধমনী সকলের স্ফীতি, চক্ষুর ঝলসন, নাসারন্ধ্রের কম্পন, স্থায়িভাব ক্রোধ, রস রৌদ্র।

বিশ্লেষিত অংশে গর্ব একই কথার দৃঢ়তাব্যঞ্জক পুনরুক্তিতে (এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে) মতি (belief) এবং আবেগ ঐ একই সূত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে লুৎফ-উন্নিসার আকাঙ্ক্ষার যে বিরোধিতা নবকুমার করেছেন এবং তা করেছেন কপালকুণ্ডলার জন্য তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিরোধ (Ogden কথিত interest of clash)। সঞ্চারিভাবসমূহের দ্বারা স্থায়িভাব ক্রোধ রমণীয়তা লাভ করেছে এবং তার রসত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে রৌদ্রে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব স্থায়িভাবের রসাভিব্যক্তির সহায়তা করেছে undertone রূপে। কাজেই ঐ ভাবসমূহ স্থায়ীর পরিজনসদৃশ।

আমরা রসচর্বণার উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এখন বিচার্য ঐ উপাদানসমূহ কি ভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে রসপ্রতীতি জন্মায়।

বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রস উপচিত হয়। এই হোল ভরতমুনির সূত্র। কিন্তু ভরতমুনির সূত্রে স্থায়িভাবের উল্লেখ নেই এবং সংযোগের উপায়টি ব্যাখ্যাত হয়নি। সংযোগের স্বরূপ নির্ণয় নিয়ে ভাষ্যকারেরা বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁদের ভাষ্যকে কেন্দ্র করে এক একটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। অলঙ্কারবাদীরা বলতে চেয়েছেন ঐটে রসবৎ অলঙ্কার। নৈয়ায়িকেরা বললেন বিভাবানুভাব, সঞ্চারিভাব হোল Premise এবং তাদের সহযোগে উপচিত স্থায়িভাব হোল Conclussion। এর কোনোটাই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়। কেননা দুটি ক্ষেত্রেই রসের আধার অভিনেতার সহৃদয়তা বা সহৃদয় অনুকর্তা এবং তার মধ্যে স্থায়িভাবের অনুমানে পাঠক বা দর্শক আনন্দ অনুভব করে। পাঠক কেবল তটস্থ ব্যক্তি, তার ভিতরকার স্থায়িভাবের সম্বন্ধ এবং বর্ণিত স্থায়িভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক অনির্ণীত থেকে যায়। অর্থাৎ লৌকিক চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সাহিত্যে অভিব্যক্ত চিত্তবৃত্তির পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। অথচ প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত হোল সাহিত্যের আস্বাদ অলৌকিক এবং তা স্বগত ও পরগত।

ভট্টনায়ক উপর্যুক্ত দোষ খণ্ডন করে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর মতবাদ 'ভুক্তিবাদ' নামে খ্যাত। ভট্টনায়কের বিশ্লেষণে দুইটি নতুন কথা পাওয়া গেল। একটি "ভাবকতা" অপরটি "ভোজকতা"। ভাবকতা হোল শব্দার্থের দ্বারা দেশ-কাল অনালিঙ্গিত সাধারণীকৃত রূপ এবং ভোজকতার ফলে ঐ সাধারণীকৃত রূপ মানসভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠে। ঐ মানসভোগই হোল রস। অর্থাৎ ব্যাপারটা
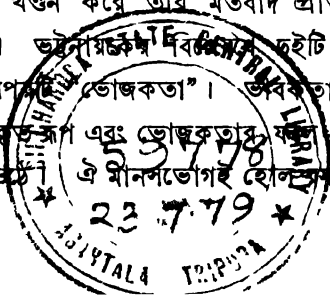
হোল এই যে বিভাবাদি থেকে ভাবকতা এবং ভোজকতা ব্যাপারের দ্বারা সামাজিকের চিত্তে স্থায়িভাব নিষ্পাদিত হয়। বিভাবাদির ভাবকতা সম্পাদনের পর ভোজকতার দ্বারা সহৃদয়ের চিত্তে তার আস্বাদন ঘটে। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে ভট্টনায়ক কাব্যপাঠ বা অভিনয় দর্শনের ক্ষেত্রে সহৃদয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ব্যাখ্যাও খুব সন্তোষজনক নয়। কেন নয়? এইবারে তাই আলোচনা করব। ৪০ : c-475, Bc9 /

আচার্য অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের মতবাদের উপরে ভিত্তি করে রসতত্ত্বের ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর মতবাদ 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত। অভিনবগুপ্ত বললেন দেশকাল অনালিঙ্গিত চিত্তের স্বাধীন স্ফূর্তি আনন্দময়। শব্দার্থের যে ব্যাপারের দ্বারা ভাবকত্ব সিদ্ধ হয় তারই দ্বারা ভোজকতাও সম্পাদিত হতে পারে। এর নাম হোল ব্যঞ্জনা। যে উনানের তাপে জল গরম হয় সেই একই তাপে ভাতও সিদ্ধ হয়। একই ব্যঞ্জনার দ্বারা শব্দার্থের সাধারণীকৃতি যেমন হয়, তেমনই ঐ ব্যঞ্জনা রসচর্বণার হেতু হতে পারে। কাজেই ভট্টনায়কের ভাবকতা এবং ভোজকতা কল্পনা গৌরবদুষ্ট, তাই পরিত্যাজ্য। পরন্তু বিভাবাদির সাধারণীকৃতি ঘটলে স্থায়িভাবের চর্বণাত্মক অনুভূতি রসপ্রতীতির কারণ এবং তা ব্যঞ্জনার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। কেবলমাত্র বিভাবাদির প্রতীতিই রস নয়। বিভাবাদি বাচ্যার্থ মাত্র। তারা বিগলিত হয়ে স্থায়িভাবের আস্বাদনমূলক প্রতীতি জন্মাতে পারলেই রসসৃষ্টি হয়। অতএব ভট্টনায়কের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় ত্রুটি হোল এই যে, তাতে বিভাবাদির তিনটি অঙ্গের ব্যাখ্যা মেলে, চতুর্থ অঙ্গ তথা প্রধান অঙ্গের ব্যাখ্যা মেলে না। আচার্য অভিনবগুপ্ত ব্যঞ্জনাতত্ত্বের দ্বারা সংযোগের সুষম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—

"রসধ্বনিঃ স এব যো বিভাবানুভাবব্যভিচারিণসংযোজনোদিত স্থায়ি—প্রতিপত্তিকস্য প্রতিপত্তুঃ স্থায্যংশ্চর্বণাপযুক্তঃ আস্বাদপ্রকর্ষঃ"

[বিভাবানুভাব ব্যভিচারিভাব সংযোগে সমুদিত পাঠকচিত্তের স্থায়িভাবের আনন্দময় চর্বণা হোল রসধ্বনি।]

এখানে বলে রাখা ভাল 'রসধ্বনি' কথাটি অভিনবগুপ্তের সৃষ্টি। এবং রসধ্বনির কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

ভরতমুনির রসসূত্রে স্থায়িভাবের উল্লেখ নেই। কারণ হোল এই যে, বিভাবাদি পাঠকচিত্তে ব্যঞ্জনাশক্তির যে উত্তাপে বিগলিত হয় সেইটে পাঠক-চিত্তেরই স্থায়িভাবের কোনও না কোনও একটির উত্তাপ। আমরা পূর্বে বলেছি পাঠকচিত্তে ৮/৯টি স্থায়িভাব

বাসনা সংস্কার রূপে নিহিত আছে। কবিকর্মের বিশেষ প্রক্রিয়াবশে তাঁর অভিলষিত রসের প্রকাশ অর্থ অনভিব্যক্ত কোনও একটি স্থায়িভাবের আস্বাদনমূলক অভিব্যক্তি। এখানে একদিকে থাকে বিভাবাদির objective জড় বাচ্যার্থ, অপরদিকে পাঠকচিত্তের subjective স্থায়িভাব। এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কে রসোৎসারণ ঘটে না—রসোৎসারণ ঘটে পারস্পরিক আনুকূল্যে। এই আনুকূল্যের ফলে অনভিব্যক্ত স্থায়িভাবের রসপ্রতীতি জন্মে। এইটে কি ভাবে হয়? কবি চিত্তবৃত্তি সমূহকে নিজের মধ্যে অনুভব করেন, সংস্কারক্রমে হৃদয়সম্মিলনের বাহনরূপে চর্বণার উপযুক্ত করে পরিবেশন করেন। হৃদয় সংবেদ্য হওয়ার মূলে থাকে বিভাবাদির দ্বারা সংস্কারের সাধারণীকরণ। অর্থাৎ ক্রোধ, শোক, রতি ইত্যাদি জীবজগতের মৌলিক বৃত্তিকে স্পর্শ করবার ক্ষমতাকে বলেছি সাধারণীকরণ। অনভিব্যক্ত স্থায়িভাবকে অভিব্যক্ত করে রসসৃষ্টি কবিকর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছে তখন অভিব্যক্ত করবার উপায় হিসেবে বিভাবানুভাবের সংযোগ কল্পনা করা হয়েছে। এই জন্য মুনি ভরত স্থায়িভাবের উল্লেখ করেন নি। বিশ্বনাথ কবিরাজও জানিয়েছেন,—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতিরত্যাদি স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম॥

[সাহিত্য দর্পণ ৩.১]

এর ব্যাখ্যা বোধ করি আর দিতে হবে না।

মোটের উপর কথাটা দাঁড়ালো এই যে, সকল রসের অবলম্বন চিদ্গত স্থায়িভাব। স্থায়ী যতক্ষণ কবিকর্মের দ্বারা অভিব্যক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তা ভাবপদবাচ্য, অভিব্যক্ত হয়ে আস্বাদ্য হলে তা রস। এই রস হেতুমূলক ব্যাপার নয়, উৎপাদন নয়—অনুভবসাক্ষিক।

অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যার পর থেকে রস কাব্যের আত্মা বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ পাদপীঠ লাভ করেছে। সৎকাব্যকে ব্যঙ্গার্থ প্রধান কাব্য বলা হয়েছে। আমরা পূর্বে দেখেছি ব্যঙ্গার্থ রস ব্যতিরেকে বস্তু এবং অলঙ্কার হতে পারে। এই সমস্যার সমাধান কল্পে অভিনবগুপ্ত বললেন,—"তদ্ বস্তলংকার ধ্বন্যভিপ্রায়েণ অঙ্গমাত্রত্বম্ ইতি সিদ্ধ সাধনম্।" রসই কাব্যের মুখ্য বস্তু ও অলঙ্কার-রসের প্রকাশ-সহায়ক বলে গ্রাহ্য করতে হবে। রসের প্রকাশ-সহায়কের কারণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে,—"বীতবিঘ্নপ্রতীতি সংগ্রাহ্য ভাব এব রসঃ।" লৌকিক জীবনে এইরূপ অভিব্যক্তি নানা কারণে বিঘ্নিত হয়। কাব্যশিল্পে বিভাবাদি

ঐ বিঘ্ন অপসারণ করে ফলে প্রতিমিতিত্ব বোধ থেকে কাব্য মুক্তি লাভ করে এবং অখণ্ড আনন্দ দান করে। বিভাবাদিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সেগুলো বস্তু এবং অলঙ্কার। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিভাবাদি বিঘ্ন অপসারক রূপে রসের প্রকাশে সাহায্য করে। এদের যথাযোগ্য সমাবেশ ব্যতিরেকে রসের অভিব্যক্তি ঘটে না। এই কারণে বিভাবাদির মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। এই কারণে অভিনব-গুপ্ত সিদ্ধান্ত করলেন,—

"শব্দ সমর্প্যমাণ হৃদয়-সংবাদ সুন্দর বিভাবানুভাব সমুচিত প্রাগ্-বিনিবিষ্ট রত্যাদি বাসনানুগরাগ স্বসংবিদানন্দ চর্বণা ব্যাপার রসনীয় রূপো রসঃ।"

এর অর্থ হোল এই যে, শব্দার্থের দ্বারা এবং যথাযোগ্য-বিভাবানুভাবের সংযোগে সহৃদয়ের চিত্ত গুহাহিত স্থায়িভাবের আস্বাদনমূলক আনন্দময় ব্যাপার হোল রস। এই বিশিষ্ট আনন্দ সংবিদের চর্বণাত্মক অববোধ অর্থ কাব্য বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য উপলব্ধি। এই কথাও এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, কাব্য বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে আমরা যেমন একত্ব উপলব্ধি করি, তেমনই একই সময়ে একত্ব উপলব্ধিও করি না অর্থাৎ আস্বাদ ব্যাপারটা স্বগত এবং পরগত। রস সৃষ্টি ব্যক্তিগত অথচ ব্যক্তি স্বভাব বর্জিত। এর প্রধান গুণ অলৌকিকত্ব। এইবারে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ;—

"বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল রাজা
রাবণ ; —বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী
ধুতুরার মালা যেন 'ধূর্জ্জটির গলে' !—
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বূরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিলা কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল বণিতা
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুল ভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধু মুখে, তিতি অশ্রুনীরে
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ নিনাদে !"

[মেঘনাদ বধ, নবম সর্গ]

এই কাব্যাংশের আলম্বন বিভাব রাবণ, উদ্দীপন বিভাব মেঘনাদের মৃত্যু এবং পারলৌকিক ক্রিয়া, অনুভাব ধীর পদে চলা, অশ্রুপূর্ণ আঁখি, নীরবতা ব্যভিচারিভাব, বিষাদ, মোহ, আবেগ, স্থায়িভাব শোক, রস করুণ।

এই ঘটনাটি বাস্তব জীবনে ঘটলে শত্রু-মিত্র-ঔদাসীন্য নানা সম্পর্কের দ্বারা বাধিত হয়ে রস ভঙ্গ ঘটত। অর্থাৎ কাব্য বস্তুর সঙ্গে তন্ময়ী ভবন না ঘটলে আমরা উদাসীন থাকতাম তাহলে রসপ্রতীতি ঘটত না, আবার তার সঙ্গে যদি জড়িয়ে পড়তাম তাহলেও আস্বাদন মূলক ব্যাপারটি বাধিত হত। এই জন্য দরকার বস্তুর নৈকট্য এবং মানসিক উত্তরণ। কেননা রসাস্বাদন কাব্যগত নয়—সহৃদয়ের হৃদগত। আমরা কাব্য বর্ণিত রাবণের শোকের সঙ্গে তাদাত্ম্য হয়েছি তার মূলে রয়েছে ব্যঞ্জনাবৃত্তি।

ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা রসতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তার সঙ্গে য়ুরোপীয় রসবেত্তাদের চিন্তার ঐক্য রয়েছে। তাদের চিন্তার ঐক্য আমরা সামান্য আলোচনা করব।

অধ্যাপক ব্রাডলি সেক্সপীয়ারের নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন,— "When we are immersed[1] in a tragedy we feel towards disposition[2] actions[3] and persons[4] such emotions[5] as (attraction and repulsion)[6], pity[7], wonder[8], fear[9] terror[10] or perhaps hatred[11], but we do not *Judge*[12]. This is a point of view, in reading a play, we slip, by our own fault or the dramatists, from (the tragic position)[13] or (when in thinking about the play afterwards we fall back on our everyday legal and moral notions)[14]. But tragedy does not belong anymore than religion belongs to the sphere of these notions, neither does the imaginative attitude in presence of it. (While we are in its world we watch what is seeing that so it happened feeling that is petious, dreadful, awful,

1. চিত্তবৃত্তির নিমগ্নতা (তন্ময়ীভবন, হৃদয় সম্মিলন) 2. ব্যভিচারিভাব. 3. অনুভাব, 4. আলম্বন বিভাব 5. স্থায়িভাব 6. রতি—শৃঙ্গারের স্থায়িভাব, দ্বেষ—ক্রোধ ও রৌদ্রের স্থায়িভাব, 7. ক্রন্দন—করুণের স্থায়িভাব, 8. বিস্ময়—অদ্ভুতের স্থায়িভাব, 9. ভীতি—ভয়ানকের স্থায়িভাব, 10. বিভীষিকা—বীভৎসের স্থায়িভাব, 11. ঘৃণা—জুগুপ্সার স্থায়িভাব, 12. রসজ্ঞানে জ্ঞেয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক মিথ্যা-সংশয় বিবেচনা থাকে না। 13. সহৃদয়তা এবং তজ্জনিত অলৌকিক জ্ঞান, 14. লৌকিক জ্ঞান,

mysterious, but neither passing sentence on the agents nor asking whether the behaviour of the ultimate power towards them is just.)[15]

[The Substance of Shakespearean Tragedy. p. 24
Shakespearean Tragedy, A. C. Bradley]

ব্রাডলির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নাটক (ট্রাজিডি) পাঠকালে আমরা পাত্র পাত্রীদের বিভাবানুভাবের দ্বারা উদ্রিক্ত স্থায়িভাবের সঙ্গে আমাদের চিদ্গত স্থায়িভাবের ঐক্য অনুভব করি। এর মূলে রয়েছে লৌকিক জ্ঞান—ঐ লৌকিক জ্ঞান রসত্ব প্রাপ্তির ফলে অলৌকিকত্ব লাভ করে, কেননা চিত্তবৃত্তির সাধারণীকৃতির ফলে তা সীমায়িত গণ্ডি ভেঙে সর্বলোকের বস্তু হয়ে উঠে। লৌকিক ভালমন্দের ঊর্ধ্বে উঠে স্থায়িভাবের চর্বণাত্মক অববোধ আনন্দময় হয়ে উঠে। এই প্রক্রিয়াকে ক্রোচে বলেছেন, "Poetic idealisation"—তাঁর মন্তব্য এই রকম,—

"For poetic idealisation is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his effort."

[European Literature in the Nineteenth Century
Benedetto Croce.]

এই কারণে অভিনবগুপ্ত বলেছেন, দুঃখসন্তপ্তের পক্ষে কাব্যরচনা তখনই সম্ভব যখন স্রষ্টা দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। বাল্মীকি যতক্ষণ বিরহব্যথাক্লিষ্ট ক্রৌঞ্চের দুঃখে অভিভূত ছিলেন ততক্ষণ কাব্যসৃষ্টি করতে পারেন নি। কাব্যরচনা তখনই সম্ভব হোল যখন ঐ দুঃখবোধ থেকে তাঁর মানসিক উত্তরণ ঘটেছিল। এর আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প, এরিখ মারিয়া রেমার্কের "All quiet on the western front" গ্রন্থ, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের "The old man and the Sea" গ্রন্থটির কথা। এঁরা সকলেই বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গে থেকেও তার থেকে মানসিক উত্তরণের সূত্রে অনবদ্য সাহিত্য রচনা

15. অত্র সাধারণীকরণ তত্ত্বং ভাব্যম্।

করেছেন। এর থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সৃষ্টির মূলে রয়েছে একদিকে বিষয়বস্তুর নৈকট্যবোধ, অপরদিকে তার থেকে মানসিক উত্তরণ। পূর্ণিমার চাঁদের আহ্বানে সমুদ্রের বুকে যেমন বান ডাকে, তেমনই শিল্পী যে স্থায়িভাবের রসাভিব্যক্তি দেন তার থেকে তাঁকে ঐ চাঁদের মতো দূরত্ব রক্ষা করতে হয়। এই কারণে বলা হয় সার্থক সৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অন্তরতম এবং দূরস্থিত বস্তু। সাহিত্য দেশকাল অনালিঙ্গিত বস্তু। আধুনিক মনোবিদ এই কথা স্বীকার করেছেন। C Bullough বলেন,—"......in peotic and artistic activity the peculiarity lies in that the personal character of the relation (between the self and the object) *has been filtered*). It has been cleared of the practical, concrete nature of its appeal."

[British Journal of Psychology. Vol. V]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কাব্যে যে, বিষয়বস্তু বর্ণিত হয় তার সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকি না, এবং তার সঙ্গে আমাদের লৌকিক কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না, পরন্তু সহৃদয়তার বশে কাব্য বর্ণিত বস্তুর সঙ্গে অনুভূতির ঐক্যে মিলিত হই, ফলে তা আনন্দময় চর্বণার বিষয় হয়। এই কারণে দুঃখের কাব্যও আনন্দ দান করে। এই সূত্রে ক্যাজিয়ারাবের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন,—

"If in real life we had to endure all those emotions which we live in Sophocles', Oedipus or in Shakespeare's King Lear we should scarcely survive the shock and strain. But art turns all these pains and outrages, those cruelties and atrocities into a means of self-liberation, thus giving us an inner freedom which cannot be attained in anyother way."—শিল্পের এমনই মহিমা যে, যে সকল প্রচণ্ড অনুভূতির উদ্দণ্ড বিক্ষেপ ব্যবহারিক জীবনে আমাদের পীড়িত করে, তাই শিল্পের ক্ষেত্রে চিদাবরণ ভঙ্গের সূত্রে অলৌকিক আনন্দ দান করে, কারণ সেখানে চৈতন্যের পূর্ণস্ফূরণ ঘটে। সংবেদনঘন আত্ম চৈতন্যের আনন্দানুভূতিই রসাস্বাদ।

ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন, চৈতন্যের তিনটি অংশ আছে—(ক) সৎ (খ) চিৎ (গ) আনন্দ। তিনটি অংশের উপর তিনটি আবরণ আছে,—(ক) অসত্তাপাদক (খ) অভানাপাদক (গ) অনানন্দপাদক। কবিকর্মে ঐ আবরণ স্বরূপ বাধাগুলো অপসৃত হয়, ফলে আনন্দ-স্বরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে। একে

ভাষান্তরে বলা হয়েছে,—Self liberation thus giving us an inner freedom"। আনন্দ বস্তুতে নেই,—রয়েছে সহৃদয়ের চিত্তে অর্থাৎ inner freedom."। এই বস্তু অনুভূতি-সংবেদ্য। এই যে আনন্দ আস্বাদ তাকে বলে "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর।" ব্রহ্ম নিরুপাধিক—উপলব্ধিগম্য সত্তা, জ্যামিতিক প্রমাণের বিষয় নয়। সাহিত্যের আস্বাদ নিরুপাধিক নয়, বিশেষ বিশেষ স্থায়িভাবের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে নামরূপ লাভ করে। তাই কোনোও কাব্যকে বলি করুণ-রসের, কোনও কাব্যকে বীররসের। তাই এই বস্তু ঠিক ব্রহ্মস্বাদ নয়—তার সমাপবর্তী মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে,—"রসো বৈ সঃ"—তিনিই রসস্বরূপ, সবকিছুর অন্তরালে তিনি প্রচ্ছন্ন। সাহিত্যকর্মে অন্তরালশায়ী সেই রসস্বরূপকে নামরূপের দ্বারা চিহ্নিত করে অভিব্যক্ত করা হয়। ব্রহ্ম উপলব্ধির মতো সাহিত্য অনুভব সাক্ষিক।

রসাভাস তত্ত্ব:—আমরা আলোচনা করে দেখলাম বাক্য রসাত্মক হলেই তা কাব্য। রসই কাব্যের আত্মা। কবি তাঁর অভিলষিত রসের অভিব্যক্তির জন্য যথাযোগ্য বিভাবাদিকে উপাদানরূপে ব্যবহার করেন। বিভাবাদির বিন্যাসে যদি ঔচিত্য রক্ষিত না হয় তাহলে রসের প্রতীতিতে ব্যত্যয় ঘটে। একে বলা হয় রসাভাস। যেমন বলা যেতে পারে, বীররসের প্রকাশে ওজঃ গুণের আশ্রয় এবং তদনুযায়ী উপমা অলঙ্কার এবং ছন্দানুবর্তন আবশ্যিক। মেঘনাদ বধ কাব্যে ঐ গুণসাম্য রয়েছে বলেই তা রসোত্তীর্ণ আবার 'বৃত্রসংহার' কাব্যে তার অভাব রয়েছে বলে তা রসাভাসদুষ্ট অর্থাৎ রস আভাসিত হচ্ছে কিন্তু তার পূর্ণত্ব আসেনি। আবার এমনও দেখা যায় যে, কাব্যে বিভাবাদির যথোপযুক্ত সমাবেশ ঘটেছে, রসের প্রতীতিও ঘটেছে তবুও আমাদের বিশিষ্ট সমাজে জীবনচর্যার ফলে গড়ে উঠা সমাজ মানসের বিরোধী হওয়ায় রসাভাস ঘটল। যেহেতু রস সহৃদয় হৃদয়-সংবেদ্য, সেইজন্য আলঙ্কারিকেরা বললেন, সমাজ মানসের বিভিন্নতার দরুণ এইটি ঘটে, এরূপ ক্ষেত্রে কোনও সহৃদয় যদি সহৃদয়তার বশে ঐ বিরোধিতাকে অতিক্রম করতে পারেন তাহলে ঐ সৃষ্টি রসাভাসদুষ্ট বলা চলবে না। যেমন বলা যেতে পারে বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলীতে দুইটি মাতৃচরিত্র কবিরা এঁকেছেন। যশোদা এবং মেনকা। মাতৃচরিত্রাঙ্কনে বাৎসল্যের প্রকাশ ক্ষেত্রে উদ্দীপন বিভাবের তফাৎ রয়েছে। শিশুকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত যশোদা এবং বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে সম্পর্কিত মেনকা। শিশু এবং উমার ভিতরে সন্তান হিসেবে সাধারণ ঐক্য রয়েছে। তবুও তফাৎ রয়েছে সূক্ষ্ম।

এই তফাতের মূলে রয়েছে কৃষ্ণ এবং উমার মধ্যে বয়ঃধর্ম। শিশু এবং মায়ের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে। কাজেই বলা যেতে পারে ভারতীয় যশোদা য়ুরোপীয় ম্যাডোনায় প্রতিভাত হয়েছেন অথবা য়ুরোপীয় ম্যাডোনা ভারতীয় যশোদায় প্রতিভাত হয়েছেন। পক্ষান্তরে মেনকার চরিত্র দেশিকতা এবং লৌকিকতার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, যদিও তার হৃদয়বত্তার আবেদন রয়েছে। কেননা বয়স্থা, বিবাহিতা কন্যার পিত্রালয়ে আসা যাওয়ার জন্য কান্নাহাসির জোয়ার-ভাঁটা, কন্যাকে কাছে পাওয়ার জন্য মাতৃহৃদয়ের যে আকুলতা, পেয়েও আবার বিচ্ছেদের জন্য হাহাকার, তা একান্তভাবে বাংলাদেশের সম্পদ। বাংলা-দেশের সামাজিক যে ভাবে তাকে আস্বাদন করতে পাবে অপর কেহ যদি সেই ভাবে আস্বাদন করতে পারে অথবা হৃদয়বত্তার আবেদনটুকু আস্বাদন করতে পারে তাহলে শাক্তপদাবলী রসাভাসদুষ্ট হয়েছে বলা চলবে না। কারণ ঐ কাব্যের স্থায়িভাবের আস্বাদনে প্রকারভেদ ঘটতে পারে কিন্তু তাই বলে কাব্য হিসেবে তার মর্যাদার ঘাটতি হতে পারে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কাব্যকে একান্ত ভাবে সহৃদয়-নির্ভর করে তোলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রসাভাস তত্ত্বের সঙ্গে রসতত্ত্বের (Aesthetic) কার্য-কারণগত সম্পর্ক নেই। তাই যদি না হোত তাহলে ইন্দ্রের গুরুপত্নীগমন কাহিনী, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', গৌরকিশোরের "আমরা যেখানে" সমাজ মানসে আঘাত করে বলে ববাদ হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হয় নি—এই সবই রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। কারণ পাঠক সকল সংস্কারকে অতিক্রম করে দেশকাল বিনির্মুক্ত হয়ে তার রসাস্বাদ করে। রসাভাস তত্ত্বের বিচার হবে ঔচিত্য বিধির নিরিখে। একটি কাব্যৌচিত্য অপরটি সামাজিক ঔচিত্যবিধি।

আমাদের আলোচনায় এইটে স্পষ্ট হয়েছে যে পাঠক সঞ্চারী ভাব নিরপেক্ষ ভাবে স্থায়ী ভাবের রসরূপান্তরটুকু আস্বাদন করতে পারে। এই সূত্রকে প্রলম্বিত করে বলা যেতে পারে যে এক যুগের কাব্য আস্বাদনে অপর যুগে যে পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে রয়েছে সঞ্চারিভাবের হেরফের। সঞ্চারী ভাব হোল তাৎকালিক এবং স্থায়ী কালোত্তীর্ণ। তাৎকালিকতার সূত্রে সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়—এইটে ভাবের বস্তু। রামায়ণ মহাভারতকে আজ কেউ আধুনিক বলবেন না। কিন্তু যেদিন তা রচিত হয়েছিল সেদিন তা আধুনিক ছিল অর্থাৎ সেদিনকার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে থাকা সঞ্চারিভাবের সঙ্গে তার সঙ্গতি ছিল। আজ সেটা ঝরে পড়েছে। তবুও কাব্যহিসেবে রামায়ণ মহাভারতের মূল্য অসামান্য। এর মূলে রয়েছে স্থায়ী

চিত্তবৃত্তির সার্থক উদ্বোধন এবং সাধারণীকৃতি। প্রত্যেক সার্থক সৃষ্টির পক্ষেই এইটে সার কথা।

দ্বিতীয়তঃ সার্থক কাব্য এক রঙা নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন সেক্সপীয়র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কালজয়ী। তবুও উভয়ের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। এর মূলে আছে বিশিষ্ট রূপকলা। ঐ রূপসৃষ্টির বিশিষ্টতা অর্থাৎ Particularityর মূলে আছে সঞ্চারী ভাব এবং Universalisation এর মূলে সঞ্চারিভাবের সহায়তায় স্থায়ীয় সাধারণীকরণ। তাই শিল্প একাধারে বিশিষ্ট এবং নির্বিশেষ। যেমন বলা যেতে পারে রাজা প্রিয়ামের এবং লীয়রের শোক-নিষ্যন্দী ক্রন্দনে হৃদয়বৃত্তির ঐক্য থাকলেও প্রকাশভঙ্গীর তফাৎ তাদেরকে বিশিষ্টতা মণ্ডিত করেছে।

॥ অনুকরণ তত্ত্ব ॥

শিল্প সৃষ্টির মূলে রয়েছে জীবন ও জগতের অনুকরণের জৈবিক প্রেরণা। শিল্পের যাত্রাই সুরু হয়েছে এইখান থেকে। প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে অনুকরণের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা প্রত্যালোচনা করেছেন সাহিত্যশাস্ত্রীরা। আমরা বক্ষ্যমান নিবন্ধে অনুকরণ তত্ত্ব আলোচনার সার সংক্ষেপের সূত্রে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করব।

প্রাচ্যচিন্তা :—ভরতমুনি নাট্যবেদ রচনা করেছেন। নাট্যসূত্রে তিনি নাটককে বলেছেন লোকবৃত্তের অনুকরণ। এই প্রসঙ্গে তিনি যে term-গুলো ব্যবহার করেছেন তা হোল,—"লোকবৃত্তানুকরণম্" "লোকবৃত্তানুবর্তনম" এবং "ভাবানুকীর্তনম্।" এর ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন নাটক ক্রিয়াত্মক জীবনের রূপসৃষ্টি। মানুষের সাধ ও সাধ্যের দুস্তরতায়, অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিবেশে, ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরাগ বিরাগে, স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাতে জীবনের যে ধারা বাঁকে বাঁকে মোচড় খেয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে তার যে সার্বিক পারম্পর্য আছে এমন কথা বলা যায় না। ব্যবহারিক জীবযাত্রায় সে ধারা নানাভাবে খণ্ডিত হয়ে যায়। জীবনের এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী, স্রোতধারা কবিদৃষ্টিতে এক বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে—কবি কল্পনার প্রদীপ্ত শিখায় ঐ ধারা সুবলয়িত, অখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করে—বস্তুর বাস্তব সত্তা রসসত্তায় রূপান্তরিত হয়। একেই বলা হয়েছে লোকবৃত্তের অনুকরণ। যে শক্তির বশে এইটি সম্ভব হয় তাকে বলা হয়েছে 'কবিব্যাপার' 'কবিকর্ম' 'কবি কৌশল' এর

যে ফল পরিণাম সৃষ্টি "অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম" "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি" ডঃ সুশীলকুমার দে একে বলেছেন,—"Product of the poets mind।" এতে বস্তুর উপরে মানস জগতের প্রতিফলনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। একদিকে আছে 'Objective facts' অপরদিকে রয়েছে 'Subjective mind'। মন বস্তুকে যে ভাবে গ্রহণ করছে, বস্তু সেইভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। কাব্যকৃতিতে যে ভাবে বস্তু গৃহীত হ'ল তার সাধারণীকৃত রূপ অভিব্যক্ত হয় বলেই সহৃদয় তার সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে "লোকবৃত্তানুকরণম" হুবাহুব নকলনবিশী নয়। মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে তা সম্ভবও নয়, কারণ মন পদার্থটি আর্শি নয়। সহজেই বোঝা যায় ঐ অনুকরণ "Ideal imitation।" এখানে কবি তথ্যের জগতকে আশ্রয় করে দিব্যানুভূতির যোগে তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন, চিৎ ও জড়ের অবিনাবদ্ধরূপ সহৃদয়ের অন্তরতম সত্যকে উদ্বোধিত করে। এই কল্পনায় দেহচেতনা, হৃদয়বেদনা, মানসক্রিয়ার পূর্ণরূপ যা বস্তুসংঘাতে জেগে উঠে পরস্পরের আনুগত্যে অখণ্ড ভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাতেই সত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। একেই বলে লোকবৃত্তের অনুকরণ বা Ideal imitation. এই অনুকরণে বাস্তবের প্রচ্ছন্ন শাসন থাকে,—প্রত্যক্ষ আধিপত্য থাকে না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে আমাদের প্রত্যক্ষগম্য সৃষ্টির গূঢ়রহস্য কবি উদ্ঘাটন করেন, তাই এই রূপকে সত্য বলে মেনে নিতে হয়। কেননা তাতে সৃষ্টির সত্যই থাকে। আমাদের দেশে ঐ কল্পনা গৌরব ও সৃষ্টি রহস্য অতিপ্রাচীন কালে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের পুরাণে বলা হয়েছে ;—

"ন কবের্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ।
সর্ব্বোপর্য্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যে ন চৈব হি॥"

[বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ১৩শ শতাব্দী]

কবির বর্ণনা মিথ্যা নয়, তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। এই যুগের কবিও এই কথা আধুনিক ভাষায় বলেছেন,—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

[ভাষা ও ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে Subjectivity। প্রমথ চৌধুরী এই কথা বলেছেন,—"আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর

মাপজোখের সঙ্গে আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোখ হুবাহুব মিলে যেতেই হবে এমন কোনও নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকলি পরানো।... শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্যসামান্য কঠিন বিধি নিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি বা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়।"

[বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ। বীরবলের হালখাতা।]

শিল্পের এই শাসন অলঙ্ঘ্য। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বিষয়টিকে তাঁরা ঔচিত্যবিধি দিয়ে বিচার করেছেন। ঔচিত্যবোধ অনুকরণের ভারসাম্যহীনতার জন্য খণ্ডিত হয়। ফলে রসের প্রতীতি বিঘ্নিত হয়। পাশ্চাত্য রসবেত্তারা এই কথা স্বীকার করেছেন,—"Artistically constructed incidents"—এই কথায় আমরা পরে আসছি।

মোটামুটিভাবে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, আর্ট অনুকরণই বটে তবে জ্যামিতিক বা গাণিতিক নিয়মাধীন নয়—"অধিকতর বাস্তব" এর উপরে এর প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ বাস্তব এবং স্বপ্ন সেখানে অনুভূতির সত্যের আলোকে অখণ্ড ভাবে প্রতীত হয়। দিব্যানুভূতির বলে স্রষ্টা এবং বস্তুর মধ্যে সেতু যোজনা হয়। সাহিত্য অহং অনুবিদ্ধ অথচ অহং নিরপেক্ষ চিরবিস্ময়কর সত্তাকে অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করি। সাহিত্য ব্যক্তিসাক্ষিক হয়েও ব্যক্তিনিরপেক্ষ। কাজেই অনুকরণে বাস্তবের যথাযথ্য নয় তার অন্তর্গূঢ় উচ্ছ্বাসের স্বরূপ ব্যক্ত হয়। এই রূপসৃষ্টির কালে কবির তন্ময়ীভবন ঘটে বস্তুর সঙ্গে, তারপর তার উত্তরণ ঘটে নির্লিপ্ত লোকে, অতঃপর হয় রূপসৃষ্টি। এই রূপ হোল রসের। রসের নির্বিশেষ অভিব্যঞ্জনায় থাকে সত্যের স্পর্শ, কারণ তা ব্যক্তিস্বভাব বর্জিত। সত্যের প্রকাশ বুদ্ধিতে নেই, কারণ সেখানে থাকে সংশয়বোধ। প্রয়োজনের হুকুম তামিল করতে করতে তাতে এসে যায় আবিলতা। মনের অবিকার বিস্তারে প্রভুত্বের আত্মগৌরব আছে, সংশয় আছে। সমগ্রতা বোধে আছে প্রসন্নতা, আছে মুক্তি,—"To know all is to pardon all"—তাই সেখানে যে জ্ঞানের কথা থাকে তা হোল পূর্ণজ্ঞান, সত্যোপলব্ধি—এতে সকল সংশয়ের তিরোধান ঘটে,—এই হোল "Truth of substance" বা "perfection of experience"—কবি কল্পনাতে এইটে প্রতিভাত হয়। কাব্য মহত্তর সত্যের সন্ধান দেয়, তার আস্বাদ "ব্রহ্মস্বাদ সহোদর"! এই কারণে বলা হয় কাব্য উৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বাধীনতা স্বীকৃত, কিন্তু স্বৈরাচার স্বীকৃত নয়। সেখানেও বিধিনিষেধ মানতে হয়। এই বিধি নিষেধ হোল রসের বিধি। যাকে বলা

হয়েছে ঔচিত্য বিধি। ঔচিত্য বন্ধনই হোল রসের উপনিষৎ কাব্যতত্ত্বের পরাবিদ্যা। এইটে না মানলে সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই আচার্য আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন,—

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥"

[ধ্বন্যালোক, ৩।১০।১৪. বৃত্তি]

প্রতীচ্য চিন্তা ঃ—য়ুরোপে দার্শনিক প্লেটো দর্শন আলোচনার প্রসঙ্গে কাব্যতত্ত্ব নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন। প্লেটো বলেছেন, কবিরা জীবন ও জগতের অনুকরণ করেন তাঁদের কাব্যে। অনুকৃত জীবন ও জগৎ ক্রিয়াশীলও বটে মননীও বটে। তিনি বলেছেন,—Imitation we say, imitates men acting compulsorily or .voluntarily thinking that in the event they have done well or ill and through out either feeling pain or rejoicing।" আবার মন্ময়ী ভাবনার ক্ষেত্রে বলেছেন, ভাবনার একটি "actual form" বা "Idea" থাকে, তার রূপময় অভিব্যক্তি ঘটে। বাইরের দিক থেকে যাকে সৃষ্টি বলে মনে হয় ভিতরেব দিক থেকে তা হোল অনুকৃতি। প্লেটো এই কথাও জানিয়েছেন, কাব্যসৃষ্টির মূলে থাকে দৈবীপ্রেরণা বা আবেগ। দৈবীপ্রেরণার আবির্ভাবে কবি মানুষটি আর সাধারণ সামাজিক মানুষ থাকেন না, একটা ভিন্নতর চেতনার আবেগে প্রাণের অবাধ স্ফূর্তি, কল্পনার দিব্যোন্মাদ ঘটে। কাজেই তখন তিনি যে কথা বলেন সেইটি আটঘাঁট বাঁধা সচেতন মনের কথা নয়, ঐ বিশেষ ভাবাবস্থার ছন্দোময় বাণী। প্লেটো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন,—

······They (poets) with their beautiful melodies of verse in a state of inspiration and as it were possessed by a spirit not their own···· ·for a poet is indeed a thing ethereally light, winged and sacred, nor can he compose anything worth calling poetry until he becomes inspired and as it were mad, or whilst any reason remains in him."

[Ion, Plato]

রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলো বলেছেন এইভাবে—

"একি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী!

"আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন স্বরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে !"

[অন্তর্যামী, চিত্রা]

প্লেটো ঐ গ্রন্থে আরও বলেছেন,—" ...they are in the plumes of rapid imagination they speak the truth !" লক্ষ্য করবার বিষয় হোল প্লেটো কাব্যকে হৃদয়-সংবেদ্য বলে ঘোষণা করেছেন, এবং ঘোষণা করেছেন কাব্য সৃষ্টির মূলে আছে আবেগ, সচেতন শব্দার্থের কসরৎ কাব্য নয়, কবিরা সত্যোপলব্ধি করান। এই পর্যন্ত প্লেটোর কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই।

'Republic' গ্রন্থ থেকে প্লেটো কাব্য সাহিত্যকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর দার্শনিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বললেন যে, আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য নয় এর একটা শাশ্বত রূপ আছে যা পরিবর্তনশীল ভৌতিক জগতের ঊর্ধ্বে, সেই পরাদর্শের অনুকরণ হোল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। কাজেই এই জগৎ মিথ্যা। কবিরা এই মিথ্যার অনুকরণ করেন কাব্যে। সুতরাং কাব্যশিল্প মিথ্যার জাল বয়ন করে। এইবার শিল্প সম্পর্কে প্লেটোর মন্তব্য উদ্ধার করা যাক,—"Art is bad, because it is but the imitation of an imitation of the eternally existent reality ; poetry is bad because it tells lies, and fails to teach men that the world is a place of perfect justice ; and it is again bad because it encourages emotions. It is first unreal, secondly unrighteous, thirdly unrestrained."

[Republic]

এবং নাটক সম্পর্কে তাঁর অভিমত আরও কঠোর,—"· ·drama is parti-

cularly bad because the actors representing a variety of other characters destroy their own." (Republic)

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্লেটো স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। প্লেটোর দার্শনিক প্রত্যয়কে স্বীকার করে নিয়েও কয়েকটি প্রশ্ন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্লেটো জগতের যে শাশ্বত রূপ-কল্পনা করলেন তার মৌল উৎস বা বস্তুগত ভিত্তি কোথায়? বস্তু নিরপেক্ষ জ্ঞান নেই। চিন্তা বস্তুরই সূক্ষ্ম রূপ। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতার উপর প্রজ্ঞার প্রয়োগে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান জন্মায়। শঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে, "জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণ জন্য। প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করেই জন্মে······অতএব জ্ঞান প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু।" প্লেটোর সামনে বস্তুজগৎ না থাকলে তিনি কার উপর ভিত্তি করে পরাদর্শের কল্পনা করতেন? আমাদের সব ধারণা গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিতত্ত্বের অন্তর্গত হতেই হবে। কবিশিল্পীও এই জগতের অনুকরণ করেন। এই অনুকরণ হুবাহুব নকল নয়—জীবন ও জগতকে অবলম্বন করে ধ্যানযোগে নতুন করে তাকে আবিষ্কার করেন; তাঁদের কাছেও প্রাকৃত জগৎ মানসিক হয়ে উঠে। কাজেই যে অর্থে প্লেটো সত্যসন্ধ. সেই একই অর্থে কবিও সত্যসন্ধ,—তফাৎ কেবল উপস্থাপনার। দ্বিতীয়ত দর্শন এবং কাব্য এক জিনিস নয়, তাদের লক্ষ্যও এক নয়। দর্শন বলে জগতটা কি, তার স্বরূপ কি? কাব্য বলে জগৎ ও জীবন কেমন লাগে। কাব্যরচনা যদি একান্তভাবে মিথ্যাচার হোত, তাহলে মোহমুদ্গর বলে তা পরিত্যক্ত হোত। এমার্সন কার্লাইলের রায় অনুযায়ী সেক্সপীয়র মৃত্যুর অতলে তলিয়ে যেতেন। কিন্তু তা হয় নি। তৃতীয়ত, 'Republic' গ্রন্থে প্লেটো একান্তভাবে রাষ্ট্রবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্র কল্পনা করেছেন তাতে মানুষকে তার অনুগত করে দেখেছেন, সেখানে মানুষ তার যথা নির্দিষ্ট কাজের বাইরে পদক্ষেপ করতে পারবে না। অথচ আমরা জানি যে সাহিত্য একমাত্র শিল্পের শাসন ছাড়া আর কিছুর শাসন মানে না। কাজেই 'Republic' গ্রন্থের সাহিত্য সম্পর্কিত মতবাদ অগ্রাহ্য। বরঞ্চ Ion গ্রন্থে তিনি সৃষ্টির প্রেরণা সম্পর্কে যে গূঢ় বক্তব্য রেখেছেন— "······they are in the plumes of rapid imagination they speak the truth"—কথাটি অ্যারিষ্টটলের আলোচনায় আরও মহিমান্বিত হয়েছে। এইবার সেইটে আলোচনা করব।

প্লেটোর কাব্যজিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে শিষ্য অ্যারিষ্টটল লিখলেন 'Poetics' গ্রন্থ। **এই গ্রন্থে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন শিল্প হোল অনুকরণ ;—"Epic poetry**

ınd Tragedy, as also Comedy, Dithyrambic poetry, and most lute playing and lyre playing, are all viewed as a whole, modes of imitation."

[Aristotled, on the art of poetry. P. 24.
Translated by Ingram Bywater.]

অনুকরণ যদিও শিল্পের সাধারণ ধর্ম তবুও চরিত্রভেদে অনুকরণভেদ ঘটে থাকে। এই ভেদের মূলে রয়েছে বিষয়বস্তু, মাধ্যম এবং রীতি। সাহিত্য শব্দার্থ নির্ভর। কিন্তু তাই বলে শব্দার্থে গাঁথা সব কিছু সাহিত্য নয়। একথা পূর্বে বলে এসেছি। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য মাত্র। তবুও এখানে আলোচনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য এটুকু বলা যেতে পারে যে, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের মৌলিক তফাৎ রয়েছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে থাকে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের উপস্থাপনা, নতুনতর তত্ত্বের আবিষ্কারে তার সত্যতা খণ্ডিত হয়। ইতিহাসে থাকে বিশেষ ঘটনার বিবৃতি। ঐতিহাসিক একটি বিশেষ কালের ঘটনা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত করে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়েই যুক্ত। এইটেও কালাতীত নয়,—খণ্ডিত। কারণ নতুন তথ্যের আবিষ্কারে পূর্ব মূল্যায়ন পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ এইসবের আবেদন নিছক বুদ্ধির কাছে। কাব্যসাহিত্যে থাকে ভাবে-কল্পনায়, আবেগে বুদ্ধিতে উদ্বেলিত রূপসৃষ্টি। শিল্পী বিশেষের রূপই ধ্যান করেন কিন্তু তার ভিতরে থাকে নির্বিশেষের অভিব্যঞ্জনা। যেমন বলা যেতে পারে রাজা লীয়রের বিলাপভঙ্গী একান্তভাবে তারই তা কখনও হেক্টরের পিতা প্রিয়ামের হতে পারে না। ঐটি একান্তভাবে বিশিষ্ট, কিন্তু তার অন্তরালশায়ী হৃদয়বৃত্তি নির্বিশেষ। অর্থাৎ কাব্যে সাহিত্যে মানুষের আবেগানুভূতির যে প্রকাশ ঘটে পাত্রভেদে, কালভেদে, দেশভেদে তার প্রকাশভেদ ঘটতে পারে কিন্তু মৌলিক সত্যের ব্যত্যয় ঘটে না। অ্যারিষ্টটল এই কারণে বললেন,—"...the poet's function is to describe not the thing that has happened, but a kind of thing that might happen, i.e., what is possible as being probable or necessary. ... Hence poetry is somethoing more philosophic and of graver import than history, since its statements are of the nature rather of universals whereas those of history are singulars. By a universal statement I mean one as to what such or such a kind of man will probably or necessarily say or do—"

[Aristotle, on the Art of Poetry, P. 43.
Translated by Ingram Bywater.]

কাজেই দেখা যাচ্ছে কাব্য সাহিত্য-জীবন ও জগতের অনুকৃত রূপ, কিন্তু তা ফোটোগ্রাফি নয়।

অনুকরণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় স্বীকৃত হয়েছে,—(ক) বস্তু, (খ) কবি, (গ) অনুকৃত রূপ। বস্তুর উপরে কবির চিত্তের প্রভাব বা বস্তুর প্রতি তাঁর মনোভঙ্গী (attitude) অবশ্য স্বীকার্য (নইলে একই বস্তু বিভিন্ন লেখনীচিত্রে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করত না।) কাজেই "imitation of an appearence"-এর যাথাযথ্য নয়—তার আন্তরসত্তা, যা কবির বোধিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তারই প্রকাশ কাব্য। অর্থাৎ বস্তুর রস-রূপান্তর ঘটে। বিষয়টাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সাহিত্য সাহিত্যকারের মানসলোকের সৃষ্টি। অথচ উপাদানগুলো বাইরের। প্রথম সংঘাতের সূত্রপাত অজ্ঞাতসারে এইখান থেকে সুরু হয়। একদিকে স্রষ্টার মানসিক গঠন অন্যদিকে মানসলোকে প্রতিফলিত বাইরেকার জগৎ। দুটোরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। স্রষ্টার মানসিকতা-নিরপেক্ষভাবে বাইরের জগতের অস্তিত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই বাইরের জগতকে স্রষ্টা যখন নিজের মনে আবিষ্কার করতে করতে চলেন তখন বাইরের জগতের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে কি হয় ? স্রষ্টার লক্ষ্য আনন্দ বাইরের জগতের লক্ষ্য সুখ। যেহেতু স্রষ্টার লক্ষ্য আনন্দ সেইজন্য বস্তুর রসরূপান্তর ঘটে,—মানসভোগের ব্যাপার হয়ে উঠে। কারণ আনন্দ মনের সৃষ্টি—বহির্জগতে তা নেই, একান্তভাবে তা হৃদয়বেদ্য। কাজেই বলা যেতে পারে, অনুকরণের ভিতরে অনুভবাত্মক দিকটি মুখ্য। প্লেটো কথিত Idea-র মতো সাহিত্যও সত্য। এখানে যেইটি মিথ্যা তা হোল সুসঙ্গতির অসদ্ভাব থেকে উদ্ভুত, যা আমাদের ঔচিত্যবোধকে আঘাত ক'রে রসভঙ্গ করে। এই কারণে অ্যারিষ্টটল বলেছেন, অনুকরণ অর্থ জীবনের ঘটনাবলীর শৈল্পিক রূপায়ন—"artistically constructed incidents" এবং এর নিয়ামক—"Law of probability or necessity।" এই সময় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের তন্ময়ীভবন ঘটে এবং কল্পনা বলে সেই আনন্দময় উপলব্ধিরকালে কবি বলেন,—"O for a life of Sensations rather than of Thoughts।" ঐ 'Sensations'টাই বড়ো কথা, যার ফলে খণ্ডের মিথ্যা পূর্ণের সত্যে রূপান্তরিত হয়, জীবনের সমগ্র রূপ অনুভূতির কেন্দ্রে মণ্ডলায়িত হয়ে দেখা দেয়। এইবারে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমরা এইখানে বুচারের অনুবাদকে আশ্রয় করলাম :—

(ক) "It follows that we must represent men either as better than in real life or as worse as they are"—এখানে

কল্পনাবৃত্তির সাহায্যে গ্রহণ বর্জনের প্রশ্নটি জড়িত এবং তা Subjective যান্ত্রিক নয়।

(খ) "By plot I here mean the arrangement of incident"—এবং এই বিন্যাস হবে—"artistically constructed"—জীবনের খণ্ড রূপের অখণ্ড শৈল্পিক রূপ বিন্যাস কল্পনাবৃত্তি সাপেক্ষ। কবির বিশিষ্ট মনোভঙ্গি এখানে ক্রিয়াশীল।

(গ) "It is not the function of the poet to relate what has happened but what may happen—what is possible according to the law of probability or necessity"—এই বক্তব্য আমাদের পূর্ব মতকে সমর্থন করে।

অ্যারিষ্টটলের সূত্রাবলীর ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী কালে য়ুরোপীয় শিল্প বেত্তারা করেছেন। তার ফলে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়েছে। তাঁরা মূলতঃ কল্পনাবৃত্তিকে ভিত্তি ক'রে আলোচনা করেছেন, তার স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কাণ্টের 'Reflective Judgement' কোলরিজের 'Esemplastic Imagination' ক্রোচের 'Intutive knowledge' বা 'Creative Imagination' সবই আত্ম-সাক্ষিকতার উপর ভব ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই বক্তব্য, প্রাথমিক প্রতীতি বস্তুর সংস্পর্শে এসে জাগে, কল্পনায় তার পুনরুদ্বোধন ঘটে এব সঙ্গে স্মৃতির যোগ রয়েছে, এখানে কিছু রূপান্তর ঘটে তারপর সেই প্রতীতিকে নতুন করে বিন্যাসই হোল সৃষ্টি; কোল্‌রিজ Secondary Imagination ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—"dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate" এর মূলে রয়েছে "Struggles to idealise and to unify." কীটস একে বলেছেন, "disagreables evaporate." আমাদের দেশে আচার্য অভিনবগুপ্ত এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন,—কবি প্রথমে চিত্তবৃত্তি সমূহকে নিজের মধ্যে অনুভব করেন (এই হোল প্রাথমিক প্রতীতি) তারপর সংস্কারক্রমে অপরের মধ্যে অনুমান করেন (স্মৃতির ক্রিয়া) অতঃপর আত্মসংস্কারের সাধারণীকৃতির দ্বারা অপরের হৃদয় সম্মিলনের বাহন করেন বা চর্বণার উপযোগী করেন, (এইটে হোল নতুন করে সৃষ্টি)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত" হোল সৃষ্টি।

কাজেই এখন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে অনুকরণ যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, অনুকরণ বস্তুর আন্তর সত্তার অভিব্যক্তি। অনুকরণের ভিতরে আবেগ মনন সব কিছুর সামগ্রিক রূপ-প্রতিফলিত হয়। কারণ জীবনের ক্রিয়া কেবল মননে বা কেবল ভাবে

সীমায়িত নয়—উভয়ের স্বাঙ্গীকৃত রূপ হোল জীবন। তাই কাব্য—"is the communication of an entire experience." তাই কাব্যে মনন থাকে সৃজনশীল কল্পনার অনুগত হয়ে, তাই প্লেটোর 'unrestrained' কথাটি ঠিক নয়। তাই কাব্যের প্রতীতি হোল অখণ্ড এবং তা সত্য। এখানে Ideal ও Real অবিনাভাবে বিরাজিত। কবি কল্পনা 'world of facts' কে দিব্যানুভূতির যোগে পুনঃসৃষ্টি করেন বাস্তব experience, perfect হয়ে উঠে ফলে তা হয় চিরকালের সত্য। সত্য যে তার প্রমাণ কাব্য আনন্দ দেয়—দেয় পূর্ণের স্বাদ। প্লেটোর কথাতেই ঘুরে আসি,—"they are in the plumes of rapid imagination, they speak the truth।"

॥ ট্র্যাজিডি ॥

ট্র্যাজিডির সৃষ্টি গ্রীসে। ট্র্যাজিডি তত্ত্বের সূত্রকার অ্যারিষ্টটল। পরবর্তীকালে অ্যারিষ্টটলের সূত্র অবলম্বন করে আলোচনা-প্রত্যালোচনা হয়েছে, ভাষ্যের পর ভাষ্য রচিত হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু তাঁর মূলসূত্রকে কেউ ছাপিয়ে যেতে পারেন নি। যুগ পরিবর্তনের ফলে তাঁর সূত্রের পরিশোধন হয়েছে কিন্তু মৌলিক সত্যের ব্যত্যয় ঘটে নি। আমরা বক্ষ্যমান নিবন্ধে ট্র্যাজিডি সম্পর্কে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করব।

গ্রীক ট্র্যাজিডির উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ :—গ্রীসদেশের ডাওনিসাস উৎসবের ডিথিরাম্ব আবৃত্তি থেকে ট্র্যাজিডির উদ্ভব। ডাওনিসাসের জীবনবৃত্তের করুণ উপস্থাপনার প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে শোকানুষ্ঠানের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে দৈব নিয়ন্ত্রিত বা দৈবশাসিত জীবনের উপস্থাপনা এলো দ্বিতীয় পর্যায়ে। দেবতার জীবনবৃত্ত থেকে তা প্রসারিত হোল মানব জীবনে। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিডি ঐ পর্যায়ের নিদর্শন। অ্যারিষ্টটল আরও বলেছেন, ইস্কাইলাস কোরাসের ক্ষেত্র সংকুচিত করে দ্বিতীয় পাত্র (অভিনেতার) আমদানী করেন এবং সংলাপের গুরুত্বের উপর জোর দেন। সফোক্লিস আরেকজন অভিনেতার আমদানী করলেন ফলে কোরাসের প্রাধান্য আরও কমে গেল এবং সেই সঙ্গে দৃশ্য সজ্জা যোজনা করেন। এই ভাবে ছোট কাহিনীর পরিবর্তে বড় কাহিনী এলো। সঙ্গে সঙ্গে লঘু "Satyric form"-এর পরিবর্তে ট্র্যাজিডির গুরু গম্ভীর রীতি দেখা দিল, অর্থাৎ ট্র্যাজিডিতে 'Magnitude'

এবং 'a tone of 'dignity' দেখা গেল। এরপর ট্র্যাজিডিতে কাহিনীর বহুমুখিত্ব আমদানী হয়েছে। অ্যারিষ্টটল লিখেছেন,—"(1) The number of actors was first increased to two by Aeschylus, who curtailed the business of the chorus, and made the dialogue or spoken portion take the leading part of the play. (2) A third actor and scenery were due to Sophocles. (3) Tragedy acquired also its magnitude. Discarding short stories and a ludicrous diction, through its passing out of its Satyric stage, it assumed, though only at a late point in its progress a tone of dignity ; and its metre changed then from trochaic to iambic. (4) Another change was a plurality of episodes or acts."

[Aristotle, On the Art of poetry. p, 31-32
Trans by. Ingram Bywater.]

অ্যারিষ্টটল এই কথাও বলেছেন ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের পথে ট্র্যাজিডি ঐ পর্যায় এসেছিল,—"It was in fact only after a long series of changes that the movement of tragedy stopped on its attaining to its natural form." [ঐ]

ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা :—অ্যারিষ্টটল ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে,—"A Tragedy, then is the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, complete in itself, in language with pleasurable accessories, each kind brought in sperately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative form ; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions."

[Aristole On the Art of poetry p. 35
Trans by Ingram Bywater.]

অর্থাৎ ট্র্যাজিডি হোল জীবনের গুরুগম্ভীর ঘটনার ক্রিয়াত্মক ছন্দোবদ্ধ শৈল্পিক উপস্থাপনা এবং ঐ ঘটনা ও তার উপস্থাপনা এমন ধরণের হবে যাতে ভীতি এবং করুণার উদ্দীপন এবং বিমোক্ষণ ঘটবে। সংজ্ঞাটাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক,—

(ক) ট্র্যাজিডি গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ,—imitation of an action that is serious.

(খ) ঘটনা হবে নিটোল, তার একটি বিশেষ মহত্ব থাকবে, প্রকাশের মাধ্যম হবে ছন্দোময় (কোথাও ছন্দোবদ্ধ বাক্য কোথাও সঙ্গীত—"I mean that some portions are worked out with verse only and other in turn with song.")—"as having magnitude, complete in itself in languge with pleasurable accessories".

(গ) ঘটনা হবে ক্রিয়াত্মক, বিবৃতিমূলক নয়—"in a dramatic, not in a narrative form"

(ঘ) ঘটনা বিন্যাস এমন হবে যাতে ভীতি এবং করুণার উদ্দীপন এবং বিমোক্ষণ ঘটে—"with incidents arousing, pity and fear, where with to accomplish its catharsis of such emotions,"

ট্র্যাজিডির উপাদান :—অ্যারিষ্টটলের মতে ট্র্যাজিডির উপাদান হোল ছয়টি—"There are six parts consequently of every tragedy, as a whole, that is, of such or such quality, viz, a Fable or Plot, Characters, Diction, Thought, Spectacle and Melody" এই ছয়টি হোল বৃত্ত বা কাহিনী, চরিত্র, ছন্দ, ভাবনা দৃশ্য ও সঙ্গীত।

বৃত্ত বা ঘটনা :—উল্লিখিত ছয়টি উপাদানের মধ্যে ঘটনাকে তিনি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ঘটনা বাছাই এবং তার উপস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে ট্রাজিক সংবিদ্ জাগে। তিনি বলেছেন ট্র্যাজিক সংবিদ তখনই জাগে যখন ভীতি এবং করুণার যুগপৎ উদ্দীপনের রসরূপান্তর ঘটে। এর মূলে রয়েছে মানুষের অনুচিত ভাগ্যবিপর্যয়। ঐ ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে থাকে—"doing something terrible" অর্থাৎ রুদ্রকর্ম ভীতির সঞ্চার করে এবং "Suffering something terrible" করুণার উদ্রেক করে। আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে—"রৌদ্রস্যৈব যৎকর্ম স জ্ঞেয় করুণো রসঃ।" কাজেই ঘটনা নির্বাচন সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের নির্দেশ হোল,—"In a deed of this description the parties must necessarily be either friends or enemies or indifferent to one another. Now when enemy does it on enemy, there is nothing to move us to pity either in his doing or in his meditating the deed, except so far, as the actual pain of the sufferer is concerned and the same is true when the parties are indifferent to one another. Whenever the tragic deed, however is done within the family—when the murder

or the like is done or meditated by brother on brother, by son on father, by mother on son, or son on mother—these are the situations the poet should seek after."

[Aristotle, On the Art of poetry, p. 53
Trans. by, Ingram Bywater.]

অ্যারিষ্টটল যে ভয়ানক ক্রিয়াকলাপের কথা বলেছেন তা আমাদের মনে ভীতির উদ্রেক করে তেমনই যার প্রতি তা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতি করুণার উদ্রেক করে, অর্থাৎ মমেতি বোধে গৃহীত হলে ভীতি এবং পরস্ব বোধে গৃহীত হলে করুণা জাগায়,—"Pity is aroused by the unmerited misfortune and fear by the misfortune of a man like ourselves।" কাজেই ট্র্যাজিডির উপস্থাপ্য বিষয় সেইটি হবে, যাতে মানুষ প্রবৃত্তির উদ্দণ্ড বিক্ষেপে এমন ভয়ানক কাজ করে যার ফলে জীবনের কক্ষচ্যুতি ঘটে এবং শোচনীয় রিক্ততায় হাহাকার করে উঠে।

ঐ ঘটনা এলোমেলো-ভাবে সাজালে চলবে না—তার শৈল্পিক রূপায়ন চাই। ঘটনার উপস্থাপনার চমৎকারিত্ব চাই। এমনও দেখা যায় কাহিনীতে ট্র্যাজিক উপাদান যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও ঘটনা-বিন্যাসের দুর্বলতার জন্য ট্র্যাজিক সংবিদ (Tragic impression) জাগলো না। যেমন "নীলদর্পণ" নাটক। এই কারণে অ্যারিষ্টটল বলেছেন,—"The most important of the six is the combination of the incidents of the story. ···that the first essential life and soul, so to speak of tragedy is the plot ; and that the characters come second." কারণ, Tragedy however is an imitation not only of a complete action, but also of incidents arousing pity and fear"

[Aristotle, On the art of poetry. p. 37-38, 45
Trans. by Ingaram Bywater]

এখন বিচার্য-কাহিনী বিন্যাস কি রকমের হবে। অ্যারিষ্টটলের মতে প্রথম সর্ত হোল কাহিনী হবে আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত সুবলয়িত। আদি বলতে বুঝিয়েছেন তাকে যা অন্যকারণের প্রতিক্রিয়া-জাত নয়, কিন্তু নিজে পরবর্তী কার্যের কারণ, মধ্য হোল আদির প্রতিক্রিয়াজাত কার্যের ক্রমবিকাশ এবং অন্ত্য হোল তার পরিণতি যার পরে কোন আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। তিনি বলেছেন—"Tragedy is an imitation of an action that is complete in itself, as a whole of some magnitude."

(ঐ পঃ ৪০)

আদর্শ পূর্ণাঙ্গ একমুখীন বৃত্ত রচনা করতে হলে তিনটি ঐক্য মেনে চলতে হবে—ঘটনার ঐক্য, স্থানের ঐক্য এবং সময়ের ঐক্য। তাঁর কথিত ঐক্যবিধি প্রশ্নাতীত নয়। এবং ঐক্যবিধি গ্রীক নাটকেও সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। পরবর্তীকালে ঐক্যবিধিকে অনেকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু তাতে মূল তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটে না। কারণ অবান্তর বিষয় বর্জন করে সংহত organic কাহিনী সৃষ্টি করতে না পারলে নাটকে রসাভাস ঘটে, এই কথা সকলে স্বীকার করেন।

অ্যারিষ্টটল ঘটনা-বিন্যাসকে দুইভাগে ভাগ করেছেন,—(ক) সরল। (খ) জটিল। এর মধ্যে সরলকে বলেছেন 'Episodic Plot' এবং এই বৃত্তের মূল্য যৎসামান্য কারণ এর মধ্যে কার্যকারণ যোগ থাকে না, ফলে নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়। জটিল কাহিনীর দুইটি গুণ আছে একটি—'Peripety' অর্থাৎ পরিস্থিতি বিপর্যাস,—"A peripety is the change from one state of things within the play to its opposite of the kind described। অপরটি হোল 'Discovery'—নতুন বোধের জাগরণ। কোনও বিষয়ের অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানালোকে উত্তরণ। 'Peripety' এবং Discovery নাটকীয় কাহিনীতে একত্রে বা এককভাবে থেকে নাটকীয় ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে। নাটকের জটিল আখ্যান সৃষ্টি উপকাহিনীর দ্বারা করা যেতে পারে কিন্তু তাকে মূল কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে থাকতে হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হবে Organic whole। অ্যারিষ্টটলের নির্দেশ হোল এই রকমের,—"An imitation of action must represent one action, a complete whole with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any one of them will disjoin and dislocate the whole.

[Aristotle. On the Art of Poetry. P. 42.
Trans. by Ingram Bywater]

চরিত্র :—আমরা লক্ষ্য করেছি যে ট্র্যাজিডির লক্ষ্য হোল ক্রিয়াত্মক জীবনের অনুকরণের সূত্রে এমন ঘটনা বিন্যাস হবে যাতে ভীতি এবং করুণার উদ্রেক হয়। এইটে স্বাভাবিক যে ঘটনার অবলম্বন চরিত্র। এখন প্রশ্ন হোল কি ধরণের চরিত্রকে অবলম্বন করে ঘটনা রূপ পরিগ্রহ করবে। এই বিষয়ে অ্যারিষ্টটল বলেছেন চরিত্র হবে "highly renowned and prosperous" এই কথাটি আরও বিশদ করেছেন,—"persons above the common level।" সেক্সপীয়ীয় ট্র্যাজিডির সমালোচক অধ্যাপক ব্রাডলি এই কথা সমর্থন করেন।

তিনি বলেছেন,—"A Shakespearean tragedy...may be called a story of exceptional calamity leading to death of a man in high estate." [Shakespearean Tragedy A. C. Bradley, P. 6.]

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে চরিত্রকে "highly renowned and prosperous" বা "a man in high estate" বাচ্যার্থে না হোলেও চলে, কিন্তু চরিত্রে, চিন্তায় ধ্যানে এমন একটা অসাধারণত্ব থাকবে যার ফলে গড়পড়তা মানুষের মধ্যে সে বিশিষ্ট হয়ে উঠবে। এই বিশিষ্টতা হোল চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। এই উক্তির বীজ অ্যারিষ্টটলের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে,—"the subject (tragedy) represented also in an action and the action involves agents, who must necessarily have their *distinctive qualities both of character and thought* since it is from these that ascribe certain qualities to their actions"

[Aristotle : On the Art of poetry P. 35-36.

Trans. by Ingram Bywater.]

এই চরিত্র অতি ভাল বা অতি শয়তান হলে চলবে না। কেন? কারণ ট্র্যাজিডির উপস্থাপ্য বিষয় হোল,—"Passing from happiness to misery।" সাধুসন্তের ভাগ্যবিপর্যয় নীতিবোধকে আঘাত করে অপরপক্ষে শয়তানের ভাগ্য বিপর্যয় শোচনার উদ্রেক করতে পারে না। কাজেই তিনিই নায়ক পদে বৃত হবেন যিনি পাপে পুণ্যে ভালো মন্দের সমবায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। পরবর্তীকালে ট্র্যাজিডির ভাষ্যকারেরা নায়ক নির্বাচনের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা প্রত্যালোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন, "eminently good and just" বা "eminently bad" ব্যক্তির ভাগ্য বিপর্যয় যদি উপস্থাপনার নৈপুণ্যে ট্র্যাজিক চেতনা জাগাতে পারে তবে আপত্তির কিছু নেই। অ্যারিষ্টটল রস নিষ্পত্তির দৃষ্টি কোণ থেকে বিষয়টিকে দেখেছেন।

ট্র্যাজিডির নায়কের ভাগ্য বিড়ম্বনার মূলে থাকে তার কোনও ভুলভ্রান্তি (Error) বা চরিত্রের দুর্বলতা (Frailty)। ঐ চরিত্রগত দুর্বলতা কোনও সদ্‌গুণের প্রাবল্য বা দোষের প্রাবল্য হতে পারে। অতি ভালো যারা তাদের স্বভাবগত দুর্বলতা ট্র্যাজিডির কারণ হতে পারে। ট্র্যাজিক সংবিদ সৃষ্টির মূলে চরিত্রের কিছু না কিছু দায়িত্ব থাকবে—।"

"This is at least the hero who always contributes in some measure to the disaster in which he perishes"

[Shakespearean Tragedy P. 6. A. C. Bradley.]

চরিত্রের নিজস্ব সংস্কার ও কর্মবৃত্তির ক্রিয়মাণ ঘাত সংঘাতের সূত্রে চরিত্রের ভাগ্য বিড়ম্বিত রূপটি উদ্ঘাটন ট্র্যাজিডিতে করা হয়।

এইবার চরিত্রের সক্রিয়তার এবং নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নটি ন্যায় সঙ্গত ভাবে উঠতে পারে। কারণ বলা হয়েছে নাটক বিবৃতি নয়—ঘটনার ক্রিয়মাণ রূপ। নাটকের উপাদান জীবন; সেই জীবন নিছক ভাবাত্মক নয়,—ক্রিয়াত্মকও বটে। নাটকে প্রবৃত্তিময় জীবনের কর্মরূপটি দেখানো হয়। সৃষ্টিচক্রের ঘূর্ণাবেগের যোগে জীবন প্রবহমান—ভাগবতী সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের যোগ নিগূঢ়। ঐ প্রচণ্ড ঘূর্ণাবেগের তাড়নায় ট্র্যাজিক চরিত্র কখনও রুদ্র কর্ম করে যন্ত্রণাভোগ করে কখনও বা গতির ধাক্কায় স্বভাবগত দুর্বলতার জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে যন্ত্রণাভোগ করে। মোটের উপর গতির প্রবল অভিঘাতে স্বাভাবিক জীবনের কক্ষাবর্তন থেকে বিচ্যুত হয়ে যন্ত্রণাদিগ্ধ বিষম পরিণতি লাভ করে। এ যেন একটা কিছু নিজের অন্তর্নিহিত বেগের বশে নিজেরই নিয়তির তাডনায়, কোনও একটা বিন্দু থেকে সহসা উদ্ভূত হয়ে অগ্নিরেখ-পথে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রচণ্ড বেগজনিত আগ্নেয়দীপ্তি নাট্যরসের বস্তু। এর থেকে স্বভাবতঃ মনে হতে পারে ট্র্যাজিডির নায়ককে দৃঢ়কর্মা হতে হবে। কিন্তু এমন মনে করবার মতো কোনও ফাঁক অ্যারিষ্টটল রাখেন নি। প্রথমতঃ 'action' কথাটা তিনি ব্যবহার করেছেন দর্শনীয়তার তথা নাটকীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি লগ্ন, সেখানে যা কিছু ঘটে ঐ বিশেষ লগ্নের ঘাত-সংঘাতে। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন,—কেউ "have done something terrible" অথবা "have suffered something terrible"। প্রথমটির কার্য হিসেবে দ্বিতীয়টি দেখা দেয়, যদি কারণ খুব 'terrible' না-ও হয় তবুও "suffering terrible" হতে বাধা নেই। আবার যন্ত্রণা উত্তরণের প্রচেষ্টা না-ও থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে যন্ত্রণা কম হয় না। এতে নাটকীয় tension এর তারতম্য ঘটতে পারে এইমাত্র। "have suffered something terrible" কথাটির মধ্যে যন্ত্রণার নীরব সাক্ষিকতার ইঙ্গিত রয়েছে। এরা "have done something terrible" এর মতো "স্বকর্মফলভুক পুমান" প্রচলিত অর্থে নন, তবে চরিত্রগত "Frailty বা Error" এর জন্য যন্ত্রণাভোগ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "King

Lear" এর Lear এবং বাংলা সাহিত্যে "কৃষ্ণ কুমারী" নাটকের ভীমসিংহ। এঁদের মানসিক যন্ত্রণার দুঃসহ জ্বালা নাটকে রসরূপ পেয়েছে। এইটে নির্ভর করে নাট্যকারের বিশিষ্ট ভাবাবহ সৃষ্টি নৈপুণ্যের উপর। ঐ সৃষ্টি নৈপুণ্যের অভাবে 'নীল দর্পণ', 'প্রফুল্ল' ট্র্যাজিডি হয় নি।

বৃত্ত ও চরিত্র :—বৃত্ত ও চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টির স্থান সমধিক গুরুত্বপূর্ণ—এই প্রশ্নটি আলোচনা করে দেখা দরকার। কারণ এই সম্পর্কে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করতে না পারলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ কারণে মতভেদ ঘটেছে।

প্রথমে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য উদ্ধার করব :—

(ক) "Tragedy is essentially an imitation not of persons but of action and life, of happiness and misery, All human happiness or misery takes the form of action ; the end for which we live is a certain kind of activity not a quality. Charactor gives us qualities, but it is in our actions—what we do—that we are happy or the reverse."

(খ) "The subject represented also is an action ; and the action involves agents, who must necessarily have their distinctive qualities both of character and thought, since it is from these that we ascribe certain qualities to their actions."

[Aristotle : On the Art of Poetry. p. 36-37
Trans. by Ingram Bywater]

কাজেই দেখা যাচ্ছে অ্যারিষ্টটল ঘটনা নিরপেক্ষ চরিত্র বা চরিত্র নিরপেক্ষ ঘটনার কথা বলেন নি। একেকে অপরের উপর নির্ভরশীল করেছেন। তাঁর কথার তাৎপর্য হোল এই যে, ঘটনা হোল ব্যক্তিজীবনেরই ঘটনা এবং ঘটনার উৎস হোল ব্যক্তিস্বভাব এবং তদনুযায়ী আচরণ। নাটকে চরিত্র নিরপেক্ষ কোনও ঘটনা ঘটতে পারে না। যেহেতু নাটকের মুখ্য বিষয় হোল জীবনের সুখদুঃখ মন্থন করে রসসৃষ্টি সেই জন্য ঘটনার চমৎকারিত্ব আকাঙ্ক্ষিত। এই কারণে ঘটনাকে প্রাণবিন্দু বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারিক জীবনে পৌর্বাপর্যহীন অসংখ্য ঘটনা ঘটে। নাট্যকার উদ্দিষ্ট রসসৃষ্টির জন্য তার ভিতর থেকে ঘটনা বাছাই করে নেন এবং সেই সব ঘটনার সংস্থান নৈপুণ্য দ্বারা রস সৃষ্টি করেন। তাই অ্যারিষ্টটল ঘটনা সৃষ্টি নৈপুণ্যের উপর এত

গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাই বলে চরিত্রকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি বলেছেন, —"One may string together a series of characteristic speeches of the utmost finish as regards Dictin, and thought, and yet fail to produce the true tragic effect, but one will have much better success with a tragedy which however inferior in these respects has a plot, a combination of incidents in it."

[Aristotle. On the Art of poetry. P. 37.
Trans. by Ingram Bywater]

মোটের উপর কথা হোল চরিত্র এবং বৃত্ত অন্যোন্যসাপেক্ষ। এই সম্পর্কে ব্রাডলি ঠিকই বলেছেন,—

"The centre of the tragedy therefore may be said with equal truth to lie in action issuing from character, or in character issuing in action" [Shakespeare an Tragedy. P. 7
A. C. Bradley.]

কাজেই বলা যেতে পারে বৃত্ত ও চরিত্রের অনোন্যসাপেক্ষতা ধরে নিয়েই অ্যারিষ্টটল Pattern এর কথা বলেছেন।

মনন, সংলাপ, সঙ্গীত (Thought, Diction, Song):—সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিক কথা ভাবকে রূপে ব্যক্ত করা। নাটকের ক্ষেত্রে ঐ ভাবকে প্রত্যক্ষগম্য করে তুলতে হয়। কারণ-প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব চিন্তা বিদ্যা বুদ্ধি রয়েছে। এই নিজস্বতা দিয়ে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। নাটকে চরিত্রের মননের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। অর্থাৎ তার অনুভাব অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটিত করবে। আধুনিক কালে চরিত্র-সৃষ্টির উপর ঝোঁক পড়েছে। জীবনের বিবর্তন ঘটেছে স্থুল থেকে সূক্ষ্মের দিকে ফলে স্বাভাবিক ভাবে মননের উপর ঝোঁক পড়েছে। বার্নার্ডশ' বলেন,—"Drama is discussion and nothing but discussion"—এর অর্থ এই নয় যে উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কেবল মননের প্রকাশ নাটক। মননের সূক্ষ্মতার সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন নাটকীয়তা থাকবে।

মনন ক্রিয়ার সঙ্গে সংলাপের যোগ অত্যন্ত নিগূঢ়। চারিত্রানুগ সংলাপ ব্যতিরেকে চরিত্র সৃষ্টি দুর্বল হয়ে পড়ে, শুধু তাই নয় পরিবেশের সঙ্গেও সংলাপের সম্পর্ক হবে আত্মিক। সংলাপের মাধ্যমে যিনি পরচিত্ত আলোকিত করতে পারেন তিনি শক্তিমান শিল্পী। **কাজেই নাট্যকার থাকবেন নৈর্ব্যক্তিক। এক কথায় বলা যেতে পারে,**

নাটকের সার্থকতার পূর্ণ দাবি সংলাপের—ঘটনা বিবৃতি, চরিত্র প্রকাশ, গতি সব কিছুই সংলাপে ভর করে এগিয়ে চলে। কাজেই উপাদান হিসেবে সংলাপের গুরুত্ব সমধিক।

সঙ্গীত নাটকে অলঙ্করণের দায়িত্বই কেবল বহন করে না—নাটকের ভাবকে গভীর এবং গতিসঞ্চারী করে। সংলাপ যেখানে, নাটকীয় চরিত্র এবং সংঘাত পরিস্ফুটনে পঙ্গু হয়ে পড়ে, সেখানে প্রয়োজন হয় সঙ্গীত যোজনার। ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কথা যেখানে পঙ্গু হয়ে পড়ে, সেখানে তা রূপ পরিগ্রহ করে সুরে। এছাড়াও নাটকে বাস্তবতার স্পর্শ আনবার জন্য প্রয়োজন হয় সঙ্গীত যোজনার। বাস্তব মানুষ অনেক সময় অজ্ঞাতে গান গেয়ে উঠে তার চিন্তা, কর্ম এবং পরিবেশকে উপলক্ষ্য করে। নাটকে সেই পরিবেশের অনুরূপ চিন্তা ও কর্মে বাস্তবতার স্পর্শ আনবার জন্য সঙ্গীতে অপরিহার্যতা রয়েছে। এছাড়া কেবল সঙ্গীতের জন্য সঙ্গীত যোজনা করলে নাটকের পক্ষে তা ত্রুটি বলেই গণ্য হবে।

মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পাবে বৃত্ত এবং চরিত্রের মূল পরিকল্পনার অনুষঙ্গী হয়ে রচিত হবে সংলাপ, সঙ্গীত ইত্যাদি যাতে রসনিষ্পত্তিতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে।

ক্যাথারসিসঃ—ট্র্যাজিডির লক্ষ্য সম্পর্কে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য হোল,—"through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions" (বুচার) আবার বাইওয়াটারের অনুবাদে রয়েছে,—"incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish its cathersis of such emotions।" ক্যাথারসিস শব্দটির কোনও ব্যাখ্যা অ্যারিষ্টটল দেন নি: ফলে ঐ শব্দটির তাৎপর্য নির্ণয় কল্পে কয়েক শতাব্দী ধরে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কোনও কোনও পণ্ডিত চিকিৎসা বিধির দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন দেহের কুপিত ধাতুর মোক্ষণে দৈহিক সুস্থতা যেমন আসে, তেমনই কুপিত ভাবাবেগের মোক্ষণে মানসিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। ট্র্যাজিডির লক্ষ্য ভীতি এবং করুণার আত্যন্তিক আবর্ত থেকে মনকে ভারমুক্ত করা। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে সমাজে নানা কারণে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে হয়। অতৃপ্ত অথচ অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের নির্জ্জান স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে ভাবাবেগের সৃষ্টি করে, ট্র্যাজিডিতে তার-বহিঃনিষ্ক্রমণ ঘটে বা মুক্তি পায়, ফলে মনের সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। কেউ বা ক্যাথারসিস বলতে নাটকের ভাবদ্বন্দ্বের সমাধান জনিত প্রশান্তি

বুঝিয়েছেন। কোনও দার্শনিক পরাদর্শনের পটভূমিকায় রেখে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা বলেন, এক খণ্ড সত্যের সঙ্গে অপর খণ্ড সত্যের দ্বন্দ্বজনিত যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার সমন্বয়ীকরণ ঘটে অখণ্ড শান্তিময় পরিমণ্ডলে। ঐ সমন্বয়ীকরণের মূলে যে শক্তি রয়েছে তাকে বলে ক্যাথারসিস। এর ফলে বিক্ষোভের পরিতৃপ্তি ঘটে, সনাতন ন্যায়বোধ পরিতৃপ্ত হয়। কেউ লক্ষ্য করেছেন will এবং Idea অন্ধকামনা এবং চৈতন্যের সংঘর্ষের দুঃখময় রূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে বাসনা ত্যাগের দীক্ষাদান এবং ঐ ত্যাগের মধ্যে শান্তি, এইরূপ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হোল ক্যাথারসিস।

সকলের কথাতেই আংশিক সত্য আছে। মূল ঐক্য যেটা দেখা যাচ্ছে তা হোল ক্যাথারসিস কথাটিকে ভাবমোক্ষণ অর্থে ধরে নিয়ে যে যাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন। আমাদের মনে হয় অ্যারিষ্টটল ক্যাথারসিস কথাটি উপরে ব্যাখ্যাত কোনও অর্থে ব্যবহার করেন নি,—তিনি সার্থক রসোত্তীর্ণতা অর্থে ব্যবহার করেছেন :—"we must not demand of tragedy any and every kind of pleasure, but only that which is proper to it. And since the pleasure which the poet should offer is that which comes from pity and fear through imitation."

[Aristotle's theory of poetry and fine arts.

Prof. Butcher. Chapt. XIV]

কাজেই বোঝা যাচ্ছে ভীতি এবং করুণা, এই স্থায়িভাব দুটির উদ্দীপন ট্র্যাজিডির মূল সর্ত। ঘটনা উপস্থাপনার নৈপুণ্যে ভীতি এবং করুণা ভাবদ্বয়ের গভীর আস্বাদন জনিত আনন্দ উপলব্ধি ট্র্যাজিডির মূলকথা, একেই বলা হয়েছে— "effecting proper purgation of these emotions।" এই কারণে অ্যারিষ্টটল বললেন,—"And since the pleasure which the poet should afford is that which comes from pity and fear through imitation it is evident that his quality must be impressed upon the incident."

[Aristotle's theory of poetry and fine arts Chapt. XIV

Trans. by Prof. Butcher.]

নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্র দিয়েও বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমাদের চিত্তে যে নয়টি স্থায়িভাব আছে তার অখণ্ড প্রতীতি, যা আনন্দময়; ব্যবহারিক

জীবনে তা প্রতি মুহূর্তে খণ্ডিত হয়। কবিকর্মে বিভাব অনুভাব ব্যভিচারি ভাবের সহযোগে উদ্দিষ্ট স্থায়িভাবের অভিব্যক্তি রস পরিণাম লাভ করে, ফলে তার পূর্ণ প্রতীতি জন্মে। একে বলা যেতে পারে Cathersis। অনুকরণের সার্থক্যে-এর রসোত্তীর্ণতা।

ট্র্যাজিডি পাঠের নৈতিক ফল যদি কিছু থাকে তবে তা কবির সজ্ঞান পরিকল্পনার ফল নয় অর্থাৎ তা সৃষ্টির ভিতরে নিহিত নেই—পাঠকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গীতে তা অর্থ পরিগ্রহ করে। যেহেতু কাব্য—"more philosophical than history" এই যেহেতু—"the bad fable *has* a moral and the good fable *is* a moral।"

[Italics লেখকের]

আসল কথা হোল, ধরিত্রীর শ্যামশষ্পাবরণের তলে ভূগর্ভস্থ অনল প্রবাহের মতো জীবনের মূলে প্রবৃত্তির ভৈরবীলীলা কবি আবিষ্কার করেন এবং জীবনের জবানীতে দেশ-কাল-পাত্রের বিবিধ সজ্ঞান নাটকীয় ঘটনা সন্ধির সংঘর্ষে রূপায়িত করেন। নীতি দুর্নীতি, পাপ-পুণ্য সদসতের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর—জীবন রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তা রসরূপে ব্যঞ্জিত করেন জীবন শিল্পী। জীবন রূপায়ণে নৈতিক, দার্শনিক, সামাজিক প্রশ্নাবলী মূল সৃষ্টির অনুগত হয়েই অভিব্যক্ত হয়—সৃষ্টি নিরপেক্ষ তার অন্যবিধ মূল্য নেই। আমাদের বিশ্লেষণের সমর্থনে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে ক্যাথারসিসের তাৎপর্য নির্ণয়ে যে যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সবই সে যার দার্শনিক নৈতিক এবং সামাজিক প্রত্যয় থেকে, তাই কোথাও পূর্ণের পরশ লাগে নি।

ট্র্যাজিডির সংবিদ—ট্র্যাজিডির রসোত্তীর্ণতা নির্ভর করে ট্র্যাজিক সংবিদ্ সৃষ্টি করবার ক্ষমতার উপর। এইটে কি বস্তু? এর সম্পর্কে অ্যারিষ্টটলের বক্তব্য কি বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা তাই আলোচনা করব।

অ্যারিষ্টটল বলেছেন ট্র্যাজিডিতে "Pity and fear" উদ্রিক্ত হয়। কোথাও বলেছেন Pity or fear। স্বভাবতঃ প্রশ্ন দাঁড়ায় ট্র্যাজিডিতে ঐ দুইটি ভাবের উদ্দীপন ঘটে, না, যে কোনও একটির উদ্দীপন ঘটে এবং অপরটি তার পরিপোষকতা করে। এক কথায় বলা যেতে পারে ট্র্যাজিডির অঙ্গিরস কোনটি?

অ্যারিষ্টটল শব্দ দুইটির ব্যাখ্যায় বলেছেন,—"Pity is aroused by the *unmerited misfortune* and fear by the *misfortune* of a man like ourselves."—দেখা যাচ্ছে যে ভীতি এবং করুণা উদ্রেকের একটি সাধারণ নিমিত্ত কারণ আছে। সেইটি হোল অনুচিত ভাগ্যবিপর্যয় (unmerited misfortune)।

করুণা জাগে অনুচিত ভাগ্য বিপর্যয় দেখে এবং তারই অনুষঙ্গে আসে ভীতি যে ব্যক্তিটি দুঃখভোগ করছে তার সঙ্গে সাজাত্যবোধ উপলব্ধি করি বলে। অতি ভালো বা অতিমন্দ লোক সম্পর্কে এই রকমের চেতনা জাগে না কারণ প্রথমটির ক্ষেত্রে নীতিবোধ (moral consciousness) আহত হয় এবং দ্বিতীয়টির শাস্তিভোগের পিছনে অজ্ঞাতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন (Passive Support) যেন খুঁজে পাই। এইটেও নীতিবোধের গণ্ডিভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ ভীতি জাগে ভয়ঙ্কর ক্রিয়া-কলাপ থেকে নয়,—ভাগ্য বিপর্যয় থেকে। কারণ ভয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপ যদি ভীতি জাগাবার উপায় হোত তাহলে অতিমন্দ লোক নায়ক হতে পারত। অ্যারিষ্টটলের মতে utter villain-এর ভাগ্য বিড়ম্বনা—"neither pitiful nor terrible." মোটের উপর দেখা যাচ্ছে ঐ ভাব দুইটি ব্যক্তিকোটিক। পরস্ববোধে গৃহীত হলে করুণা, মমত্বিবোধে গৃহীত হোলে ভীতি জাগে। অর্থাৎ ভাগ্য বিপর্যস্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি ভয়ের নিমিত্তকারণ। যেহেতু শোচনা (Pity) থেকে ভয়ের উৎপত্তি সেইজন্য শোচনা স্থায়িভাব—আমাদের পরিভাষায় ট্র্যাজিডি করুণরসের নাটক। সমালোচক ব্রাড্‌লি বলেছেন,—

"The central feeling is the impression of waste. With Shakespeare, at any rate, the pity and fear which are stirred by the tragic story seem .to unite with, and even to merge in a profound sense of sadness and mystry, which is due to this impression of waste."

[Shakesperean Tragedy. P. 16.

A. C. Bradley.]

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে করুণ-রসের নাটক মাত্রেই ট্র্যাজিডি কি না। করুণ-রসের উৎসারের স্থায়িভাব 'শোক। ভরতমুনি শোকের উদ্ভবের তিনটি কারণ নির্দেশ করেছেন,—(ক) ধর্মোপঘাতজ, (খ) অর্থাপচয়োদ্ভব, (গ) শোককৃত (ইষ্টবিয়োগ)। এই বিবিধ শোকের ভিতর প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে বিভাবানুভাব সঞ্চারিভাবের সংযোগের তারতম্য। যে করুণ-রসের অঙ্গ হিসেবে বীর, ভয়ানক, রৌদ্র ইত্যাদি থাকে তার ভিতরে যে tension বা রূঢ়তা থাকে আর যে করুণ-রস সৃষ্টি বিষাদ, গ্লানি, নির্বেদ, জড়তা ইত্যাদির মিশেলে হয় তার মধ্যে tension কম থাকে। প্রথম শ্রেণীর গুণ হোল দীপ্তি, দ্বিতীয়টি দ্রুতি। এই আস্বাদনভেদে প্রথমটিকে বলা হয় ট্র্যাজিডি

দ্বিতীয়টি করুণ-রসের নাটক (pathetic) প্রথমটিতে ভাগ্যবিপর্যয়ের অগ্নিশিখার প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে, দ্বিতীয়টিতে আছে অগ্নিশিখার দূরবিম্বিত আভা। প্রথমটি কঠোর তৃপ্তির সঙ্গে প্রশান্তির উদ্রেক করে,—দ্বিতীয়টি চোখের অশ্রুবাহী নাড়িকে সঙ্কুচিত করে। প্রথমটির ভিতরে করুণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রুক্ষভীতি ব্যঞ্জনা যা ঐ রসকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে করুণ-রসেরই প্রাবল্য রয়েছে।

ট্র্যাজিডির আনন্দ—ট্র্যাজিডি দুঃখের নাটকীয় রূপ এবং সাহিত্যের এক অনর্ঘ সম্পদ। অথচ এর থেকে আনন্দ উপলব্ধি করি। কিন্তু কেন? অ্যারিষ্টটল উত্তর দিয়েছেন যে, আমাদের জীবনের ভীতি এবং করুণা নামক ভাবের কর্মময় অনুকরণের ফলে সেই ভাবগুলোর পরিচ্ছন্ন আস্বাদন ঘটে, আত্ম অভিজ্ঞতার গূঢ় উপলব্ধি আনন্দময়। বাস্তব-জীবনের খণ্ডতায় যা দুঃখকর, কাব্যের নির্লিপ্তলোকে তাই আনন্দময় হয়ে উঠে। কারণ সেখানে কোনও স্বার্থবুদ্ধি এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না—ফলে চিত্তের পূর্ণবিস্ফার ঘটে এবং তার সাক্ষাৎকার আনন্দময়। আমরা প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রায় যে সকল অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত থাকি সেইসকল অভিজ্ঞতা লৌকিক দেনা-পাওনার আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তার স্বরূপের পূর্ণ আস্বাদন হয় না; কবিকর্মে বিভাবাদির দ্বারা সেই লৌকিক বাধাগুলো অপসৃত হয়, ফলে তা অলৌকিকত্ব লাভ করে এবং আমরা কাব্যকে স্বগত এবং পরগতভাবে আস্বাদন করি। চিদাবরণভঙ্গের ফলে আনন্দস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের উপলব্ধি আনন্দময়। বিষয়টা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক,—ইডিপাস বা ওথেলো নাটকে দুঃখের অগ্নিবর্ণ মূর্তি দেখতে পাই তার সঙ্গে যদি আমাদের লৌকিক সম্পর্ক থাকত তাহলে সেই দুঃখে আমরা অভিভূত হতাম আবার যদি সম্পর্ক না থাকত তাহলে তৎসম্পর্কে উদাসীন থাকতাম, ফলে স্থায়িভাবের চর্বণাত্মক অববোধ ঘটত না। ব্যবহারিক জীবনে দুঃখে যখন উদাসীন থাকি তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান, আবার দুঃখের রূঢ় অভিঘাতে যখন অভিভূত থাকি তখনও আত্মোপলব্ধি পাণ্ডুর। এই অস্পষ্টতা দুঃখকর। কাব্যের ক্ষেত্রে সহৃদয়তার বশে কাব্য ব্যঞ্জিত চিত্তবৃত্তির সঙ্গে আত্মস্থ চিত্তবৃত্তির ঐক্যানুভূতি ঘটে আবার একই সঙ্গে তার থেকে বিশ্লিষ্টও থাকি, ভাবের পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তির আস্বাদন রস হয়ে উঠে আনন্দ দেয়। কাব্যে পথচলবার কণ্টককাঠিন্যের সংঘাতজনিত গূঢ় অনুভূতি আছে, কিন্তু পদতল ছিন্নভিন্ন হওয়ার শঙ্কা নেই। এইজন্য দুঃখ আনন্দে মূর্তি ধরে। এর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ট্র্যাজিডির আধুনিক রূপ—জীবনের শোকাবহ অপচয় ট্র্যাজিডির উপস্থাপ্য বিষয়। এই মূল সত্যকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যেতে পারে যে, আধুনিককালে এসে তার ধ্যান ও রূপের পরিবর্তন হয়েছে। সেক্সপীয়র পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে কোনও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ট্র্যাজিক সংবিদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং ঐ উপস্থাপনা খুনোখুনি, ষড়যন্ত্র, জিঘাংসা,—ইত্যাদি প্রচণ্ড প্রবৃত্তির উদ্দণ্ড বিক্ষেপের শৈল্পিক রূপায়ণের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই যুগে তা Crude বলে পরিত্যক্ত। অন্যতম নাট্যকার মেটারলিঙ্ক বলেছেন ঐসব নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে যে আদিম যুগে ফিরে গিয়ে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে একাসনে বসে আছেন, যাদের জীবন অভিজ্ঞতা হোল, "as something… …primitive, arid and brutal," কেন? "I am shown a deceived husband killing his wife, a woman poisoning her lover, a son avenging his father, a father slaughtering his children, children putting their father to death, murdered kings, ravished virgins, imprisoned citizens—in a word all the sublimity of tradition, but also how superficial and material! Blood, surface, tears and death!"

অত্যন্ত কঠোর এই মন্তব্য, কিন্তু অধ্যাপক নিকলের ভাষায়, ট্র্যাজিডি হলো "The greatest contribution।" কাজেই বোঝা যাচ্ছে ট্র্যাজিডির ধারণা পাল্টে গেছে। এলারডাইস নিকল বলেছেন,—"There is an attempt in both to pass from the Shakespearean conception of tragedy to another conception more fitting to the modern age…to move from the tragedy of blood and of apparent greatness to the tragedy where death is not a tragic fact and where apparent greatness is dimmed by an inner greatness." মানুষ যেখানে মিথ্যা বিধিনিষেধের নাগপাশে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করছে মৃত্যুর বাড়া জীবন্মৃত হয়ে জ্বালা যন্ত্রণাভোগ করছে তার রূপায়ণ আজকের ট্র্যাজিডির বিষয়, আত্মার হাহাকার যা, একান্ত অনুভূতিবেদ্য তাই আজ ট্র্যাজিডির উপস্থাপ্য। ফলে তার রূপায়ণও হয়েছে সূক্ষ্মতর।

কেন এমনটি হোল? কারণ চেতনা পরিশীলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনুভব করেছে যে মৃত্যুতেই চরম বিষাদ নেই। মৃত্যু অনেক সময় মুক্তির বার্তাবহ হয়ে আসে। পরম সত্যের আলোকে নিয়ে দেখলে দেখা যাবে তার মূল্য যৎসামান্য। মৃত্যু, শূন্যতা

অস্তিত্বের নিরর্থকতা আমাদের কাছে পরম হয়ে ওঠে তখনই, যখন আমাদের চেতনা তার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। এইটে অজ্ঞতা। ঐ অজ্ঞতার আবরণ কেটে গেলে—"There comes •to us a sudden revelation of life in its stupendous grandeur in its submissivenes to the unknown powers in its endless affinities, in its awe-inspiring misery" [Materlinck] এই কারণে বলা হয় আজকের ট্র্যাজেডি—"Tragedy of the soul" হলেও তার রূপায়ণের পার্থক্য রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবসর আছে। এখানে বাহুল্য বোধে কেবল দিক নির্দেশ করেই আলোচনা শেষ করলাম।

॥ মহাকাব্য ॥

শিল্প সাহিত্য তার কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে কথা আজ সর্বজনবিদিত এবং সর্বজনস্বীকৃত। এবং এইটেও স্বতোস্বীকার্য যে, মহৎ প্রতিভা কালবাহিত হয়েও কালোত্তীর্ণ হয়ে যায়। যেহেতু শিল্পকলার চরিত্র কালবাহিত সেইজন্য কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্যানে এবং প্রকরণে রূপান্তব ঘটে। এই কাবণে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, মহাকাব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে। এইটে আজ ঐতিহাসিক সত্য যে মহাকাব্য আদিম যুগের সৃষ্টি। সেই যুগ সামষ্টিক চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ঐ যুগপ্রবৃত্তির দিকে নজর রেখে কোনও সমালোচক মহাকাব্যকে যৌথপ্রচেষ্টাজাত কীর্তি বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু উক্ত ধারণার কোনও সারবত্তা নেই কেননা শিল্প সৃষ্টির গোড়ার কথা ব্যক্তিসাপেক্ষতা। এই জন্য এ্যাবারক্রোম্বি 'The epic' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন,—"···artistic creation can never be anything but the production of an individual mind."—শিল্প ব্যক্তিসাপেক্ষতা স্বীকার করেও ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে যায়। শিল্পে ব্যক্তিসাপেক্ষতার আনুপাতিক রূপটি নির্ধারিত হয় যুগপ্রবৃত্তির দ্বারা, তেমনই আনুপাতিক রূপটির হেরফেরে কাব্যর প্রকরণগত পার্থক্য দেখা যায়, নির্ধারিত হয়ে যায়, তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্যের মৌল উৎস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে তার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র গাথা থেকে, আখ্যান থেকে, জীবন ধ্যান থেকে। মহাকবি ঐ বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে আত্মসাৎ করে জীবন ধ্যানকে স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করে গুরুগম্ভীর ভাবে যথোপযুক্ত আঙ্গিকের

সহায়তায় বিশাল রূপ দেন। ঐকতান সঙ্গীত রচনা করেন। ঐ কাব্যে জাতির আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। মহাকাব্যে একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ স্বপ্ন জীবনের প্রতি মনোভঙ্গী জৈব মানসিক রূপ তথা জাতীয় প্রাণ-স্পন্দন ব্যক্তির আশ্রয়ে মুখর হয়ে ওঠে। বৃহত্তর জীবনকল্লোলের আড়ালে কবি চাপা পড়ে যান। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে বলেছেন,—"যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে" এমন সৃষ্টি মহাকাব্য। কবি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। দার্শনিক হেগেল মহাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে "The Philosophy of fine Art" গ্রন্থে বলেছেন,—"It follows from this that collective world outlook and objective presence of a national spirit"। হেগেল কথিত জগতের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর, জাতীয় ভাবনার প্রকারভেদ রয়েছে দেশভেদে মহাকাব্যের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু একটা বিষয়ে ঐক্য রয়েছে, সেইটি হোল বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার নৈর্ব্যক্তিকতা। দেশভেদে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কেন হোল? তার কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে এই ভাবে,—"Art is not an isolated phenomenon. It is a part of a culture linked up with the history of the culture and history of the people"।

[The Primitive Art
Leonard Adam.]

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির বসবাস রয়েছে। এক একটি জাতির নিজস্ব কৃষ্টি ইতিহাস আপন আবেগেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে গড়ে উঠেছে। ঐ ইতিহাস কৃষ্টি মৌমাছির মতো একই চক্রের অনুবর্তন করে না। ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ভেদে তার স্বরূপ লক্ষণের ভেদ ঘটে। এই কারণে ভারতীয় মহাকাব্যের উত্তরণ ঘটেছে শান্তরসে আর য়ুরোপীয় মহাকাব্যের বীররসে। রসের প্রকারভেদ ঘটলেও একটি মৌলিক ঐক্য উভয়ের মধ্যে রয়েছে। সেইটি হোল বিস্ময় বোধের উদ্দীপন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেনে রাখা ভাল যেন তেন প্রকারে বিস্ময় বোধ জাগলে তাকে মহাকাব্যের গোষ্ঠীভুক্ত করা চলবে না। তা যদি চলত তাহলে অনেক গীতি কবিতায় সাধারণ অতিতুচ্ছ বিষয়ের কাব্যোৎসারে বিস্ময় বোধের উদ্দীপন ঘটে বলে তাকে মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু তা হয় না। মহাকাব্যের বিস্ময় বোধের মূলে থাকে বিশালতা। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করি।

আমাদের মনে হয় আধুনিক কৃত্রিম আবৃত জীবন ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন

কালের নিরাবরণ জীবনাবেগের অকুণ্ঠ এবং দুঃসাহসিক অভিব্যক্তি আমাদের বিস্মিত এবং অভিভূত করে। জীবন সত্যের ভিতরকার ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য উভয়ই তুল্যমূল্য। একে নির্বিকার তদ্গত ভাবে দেখাটাই সত্যকারের দেখা। বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার সকলেই এই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁদের শিল্পকৃতিতে জীবনের অকুণ্ঠ প্রকাশ আপন স্বরূপেই প্রোজ্জ্বল। আজকের ব্যক্তিতান্ত্রিক যুগে সত্যের উপর ব্যক্তির মনোভাবের প্রভাব পড়েছে। মাইকেল সচেতন ভাবে রাবণের পক্ষে মিল্টন ভগবানের পক্ষে। রামায়ণ মহাভারত, ইলিযাড, ওডেসির কবিরা পক্ষপাত শূন্য অর্থাৎ কোথাও তাঁদের ব্যক্তিচিত্তের প্রতিফলন কাব্যে ঘটে নি। তাই ঐ কাব্যাবলী জীবনী শক্তিতেই মহাকাব্য। মহাকাব্যে কবিরা জীবন সংবেগের তাডনায় অস্থির, ঘটনা সংবেগের ঘাতে সংঘাতে চঞ্চল মানব চরিত্রের অবতারণা করেন, যারা কবিব ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতিভূ নয়,—জীবনেব ধর্মবশে যে যার অভিনয় করে যায়, তাই সেখানে সুমহৎ ক্ষমা, রূঢ বর্বরতা, ত্যাগ এবং লোভ সব তুল্যমূল্য। জীবন সত্যের ইঙ্গিত সেখানে প্রবল এবং দুর্জয়। আজ আমরা তার থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছি সেদিনকার মানুষগুলোব তুলনায নিজেদের মনে হয অতি ক্ষুদ্র—অন্ততঃ জীবন ধর্মের প্রাবল্যের দিক থেকে ক্ষুদ্রই মনে হয। তাই বিস্ময় বোধ করি। আবার জীবনের সামগ্রিক অভিব্যক্তি মহাকাব্যে নৈসর্গিক বিশালতা এনে দিয়েছে। এখানে জীবনের সমবাদী এবং বিষমবাদী রূপ প্রতিদিনকার তুচ্ছতার উর্দ্ধচারী হয়ে বিরাজ করে এবং তা আমাদের বিস্মিত করে। একে ঠিক বিস্ময় না বলে sublime বলাই সঙ্গত। কারণ এই বস্তু আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সহসা প্রবল আলোডন সৃষ্টি করে সমগ্র সত্তাকে উর্দ্ধাভিমুখী করে। এর সামনে দাঁডিযে কেবল নিজেদের ক্ষুদ্রতার প্রতীতিই জন্মে না—মুহূর্তের মধ্যেই বৃহতের সংক্রামণে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব ঘুচে যায়, এক বিরাট শক্তির স্ফুরণে চিত্ত উর্দ্ধাভিমুখী হয। Sublime কথাটির ভিতরে আকারগত বিরাটত্ব (Mathematical Sublime) এবং ব্যঞ্জনার বিশালতা (Dynamic Sublime)—দুইটিরই সমন্বয় রয়েছে। ফলে মহাকাব্যের যথার্থ স্বরূপকে তা পরিস্ফুট করে। এখানে বলে রাখা ভাল Sublime-এর যে দুটি অঙ্গের কথা বলেছি এর একটির অভাবে রচনায় Sublimity-র সঞ্চার হতে পারে, কিন্তু তা মহাকাব্য হবে না। যেমন বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতা প্রান্তিক কাব্য, শেলীর "Prometheus unbound" কাব্য Sublime, (গুণগত ভাবে) কিন্তু মহাকাব্য নয়। মহাকাব্যের প্রসঙ্গে Sublime কথাটির তাৎপর্য আকারগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে সত্য। এই কারণে মহাকাব্যের আবেদন Sublimity-তে।

মহাকাব্য সম্পর্কে সাধারণ-বক্তব্যের পরিশেষে আমরা আলঙ্কারিক বিধি বিধান সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব, তবে একটি কথা, মহাকাব্য-বা যে কোনও শিল্পকৃতির আলঙ্কারিক বিধি বিধান গড়ে উঠেছে সেই সেই শিল্পকৃতির অন্তর্গূঢ় চরিত্রের উপরে।

প্রাচ্য চিন্তাঃ—আমাদের দেশে ভামহ, দণ্ডী ইত্যাদি সাহিত্যাচার্যেরা মহাকাব্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্য দর্পণের লেখক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁদের রিকৃথ নিয়ে মহাকাব্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,—মহাকাব্য হবে 'সর্গবন্ধ.' সর্গ সংখ্যা ন্যূনতম আট বা তার অধিক হতে বাধা নেই, একটি সমগ্র সর্গে একই রকমের ছন্দের ব্যবহার থাকবে, সর্গান্তে পরবর্তী সর্গের আভাস থাকবে। মহাকাব্যে নাটকীয়তা থাকবে, এবং তা পঞ্চ সন্ধি যুক্ত হবে, সর্বোপরি থাকবে বিষয় ঐক্য-(অবশ্য ঐক্য হবে নৈসর্গিকী)। কাব্যের প্রারম্ভে নমস্কার, আশীর্বাদ, প্রার্থনা, বস্তু নির্দেশ থাকবে। এর উপকরণ হবে ঐতিহাসিক ঘটনা বা সজ্জনাশ্রয়ী ঘটনা। মহাকাব্যের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। ধীরোদাত্ত বলতে বুঝিয়েছেন,—অবিকত্থন,—যিনি আত্ম-প্রশংসা করেন না, মহাসত্ত্ব—যিনি সুখে দুঃখে অবিচল থাকেন, নিগূঢমানঃ—বিনয়ী, দৃঢব্রত—সংকল্পে অবিচল। মহাকাব্যের প্রাঙ্গন বিচিত্র চরিত্র এবং ঘটনামুখর হবে—অর্থাৎ বৈচিত্র্য বিধান দ্বারা "Mass and dignity" সম্পাদন করতে হবে – স্বভাবতঃই তা উপঘটনা যুক্ত হবে। ধর্মার্থকাম-মোক্ষ—চতুর্বর্গের বর্ণনা থাকবে, স্বভাবতঃই চরিত্র বৈচিত্র্য এসে যাবে। রস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হোল, শৃঙ্গার, বীর, করুণ, শান্ত যে কোনও একটি হবে—মহাকাব্যের অঙ্গিরস, অন্যান্য রসের অবতারণা থাকবে অঙ্গরস হিসেবে। মহাকাব্যের আকৃতি হবে গুরুগম্ভীর। মূল বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে থাকবে প্রাকৃতিক সম্পদের, নায়কের এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের বৈভবের ইতিকথা। মহাকাব্যের নামকরণ হবে কবি, কাহিনী, নায়ক ইত্যাদির অনুষঙ্গে, সর্গের নামকরণ হবে সেই সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়ের অনুসারী। মহাকাব্যের আবেদন হবে দেশকালাতিশায়ী, সেখানে অভিব্যক্ত জীবন-সঙ্গীত কালের প্রান্তর পেরিয়ে মানুষের কাছে চিরন্তন আবেদন রাখতে সক্ষম হবে। তাই বলা হয়েছে—"কাব্য কল্পনান্তরস্থায়ী জায়তে সদলঙ্কৃতি।" মহাকাব্যের মধ্যে থাকবে জীবনের মহনীয় প্রকাশ।

মোটের উপর [illegible] যাচ্ছে প্রাচ্য বিচারে মহাকাব্যের যথার্থ স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাঃ—অ্যারিষ্টটল 'Poetics' গ্রন্থে ট্র্যাজিডির আলোচনা প্রসঙ্গে মহাকাব্যের গাঢ়বন্ধ আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর বক্তব্যকে ভিত্তি

করে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশাস্ত্রীরা মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বা তাঁর সূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন। অ্যারিষ্টটলের সূত্র ধরেই আমরা এখানে অগ্রসর হব।

অ্যারিষ্টটলের মহাকাব্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন সেটা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি,—"As to the poetic imitation which is narrative in form and employs a single mètre, the plot manifestly ought as in Tragedy to be constructed on a dramatic principle. It should have for its subjects single action with a beginning, middle and end. An action single indeed with a multiplicity of parts." অ্যারিষ্টটলের ব্যাখ্যাতে দেখা যাচ্ছে যে, আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত, উপকাহিনী যুক্ত, নাট্য লক্ষণাক্রান্ত, একই ছন্দে বিধৃত একমুখীন কাহিনী মহাকাব্যের উপজীব্য। তিনি আরও বলেছেন মহাকাব্যের ছন্দ হবে "Dactylic Hexametre।" এখানে মনে রাখতে হবে প্রাচ্যে ছন্দোবৈচিত্র্য-স্বীকৃত।

উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ করেছেন মহাকাব্যের দৈহিক বিরাটত্ব এবং আত্মিক বিশালতা উভয় দিক থেকে,—"whereas in epic poetry the narrative form makes it possible for one to describe a number of simultaneous incidents ; and these if germane to the subject, increase the body of the poem. This then is a gain to the epic, tending to give it grandeur, and also variety of interest and room for episodes of diverse kind."

[Aristotle on the Art of Poetry. p. 82.

Trans. by Ingram Bywater]

উদ্ধৃত বক্তব্যের "to give it grandeur" কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ওর ভিতরে রয়েছে বিস্ময়বোধের চাবিকাঠি। উপঘটনার নিজস্ব একটি মহত্ত্ব থাকতে হবে,—"each part assumes its proper magnitude" কারণ "It adds mass and dignity to the poem," কারণ বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটাবে এবং তাদের সামগ্রিক জীবন সংবেগ কাহিনীতে বিরাটত্ব এবং বিশালত্ব আরোপ করবে। মহাকাব্যে উপকাহিনী যোজনার গুরুত্ব উভয় ভূখণ্ডের রসবেত্তাদের দ্বারা সমান স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই ক্ষেত্রে তাঁদের মতৈক্য রয়েছে।

মতানৈক্য রয়েছে কাহিনী এবং চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে। য়ুরোপীয় মতে কাহিনী হবে ঐতিহাসিক। আমাদের দেশে কেবল মাত্র ইতিহাসের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়,—সজ্জনাশ্রয়ী বৃত্ত স্বীকৃত হয়েছে। য়ুরোপে নায়ক হবেন "higher type" আমাদের দেশে ধীরোদাত্ত। ধীরোদাত্ত যে কোনও শ্রেণীর মানুষ হতে পারেন। য়ুরোপে বৃত্তের সংকীর্ণতার অনিবার্য পরিণতি নায়ক নির্বাচনের সংকীর্ণতা।

মহাকাব্য নাটকীয় গুণোপেত হবে এই ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কেননা মহাকবি "দেশ-কালের কণ্ঠে ভাষা দান করেন।" স্বভাবতঃই এহেন ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা না এসে পারে না। য়ুরোপে বলা হয়েছে—"The poet should speak as little as possible in his own person।" পরবর্তী কালে সমালোচক কার (W. P. Ker) "The Epic and Romance" গ্রন্থে বলেছেন—"Without dramatic representation of the characters Epic is history or romance, the variety and life of epic are to be found in the drama that springs up at every encounter of the personages।" সমালোচক "dramatic principle" এর উপরে একটু বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন সত্যি, অতটা গুরুত্ব স্বীকার না করলেও এটুকু অবশ্য স্বীকার্য যে মহাকাব্যে নাটকীয়তার বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আধুনিক য়ুরোপীয় রসবেত্তাদের মধ্যে যাঁরাই মহাকাব্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁরা সকলেই 'Poetics' গ্রন্থটিকে ভিত্তি করেছেন। সকলের অভিমতের বিস্তৃত আলোচনার অবসর এখানে নেই। আমরা কেবল ডিক্সনের মত উল্লেখ করব। ডিক্সন মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে,—"The true epic, wherever created, will be a narrative poem organic in structure, dealing with great character, in a style commensurate with the lordliness of its theme, which tends to idealise these characters and actions and to sustain and embellish its subject by means of episode and amplification."

[English Epic and Heroic Poety
W. M. Dixon.]

এতক্ষণ আমরা বিস্তৃত ভাবে যা আলোচনা করেছি উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি তারই সংহত রূপ। কাজেই বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। এখন আমরা বলতে পারি মহাকাব্য প্রতিদিনকার

তুচ্ছতার ঊর্দ্ধচারী হয়ে দেশ-কাল জাতিকে আশ্রয় দান করে, তা কল্পান্তজয়ী—"The structure of epic is often like a great arch through which on one side the past may be seen on the other the future."

[Encyclopaedia of Literature. Vol-I Cassell.]

এইরূপ বিশালত্বের জন্যে তাতে অভিব্যক্ত হয় "element of wonderful"

মহাকাব্যের প্রকারভেদঃ—মহাকাব্যের স্বরূপ লক্ষণকে ভিত্তি করে দুইটি শ্রেণীতে তাকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। (ক) স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য (Epic of growth বা Authertic Epic) (খ) সাহিত্যিক মহাকাব্য (Epic-of art বা Literary epic)। আমরা পূর্বে যা আলোচনা করেছি তা স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের। এখন আমরা সাহিত্যিক মহাকাব্যের আলোচনা করব।

সাহিত্যিক মহাকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। সাহিত্যিক মহাকাব্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রক্ষেপ থাকে এবং একটি বিশিষ্ট যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চেতনার প্রতিফলন ঘটে থাকে। বহুল ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুরাতন কাহিনীর আধুনিকীকরণ ঘটেছে। যেমন বলা যেতে পারে "মেঘনাদ বধ" কাব্যে আর্ষ রামায়ণের একটি বিশেষ গল্পাংশের যুগোপযোগী রূপান্তরণ ঘটেছে। ঐ কালের বিশেষ চেতনা যে ভাবে মধুসূদনকে নাড়া দিয়েছিল তার কাব্যোৎসারের সঙ্গে সঙ্গে কবির আত্ম-প্রক্ষেপও কাব্যে ঘটেছে। আবার "Paradise Lost"এ মিল্টনের পিউরিটানিক মনোভাবের প্রতিফলনের পাশাপাশি,—"In Satan's arrogance and revolt may be read Milton's vindictive hatred of the crown।" স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যে ঐ 'vindictive' ব্যাপারটি থাকে না।

দুই জাতের মহাকাব্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও মৌলিক তফাৎ রয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দেশের আনাচে-কানাচে যে সকল উপকথা, লোকগাথা, কিম্বদন্তী, রহস্য রোমাঞ্চ, ধ্যান কল্পনা নীহারিকার মতো অস্পষ্ট হয়ে থাকে তাই কোনও প্রতিভার আশ্রয়ে দৃঢ় পিনদ্ধ সংহত অথচ বিশাল রূপে দীপ্তিমান হয়ে উঠে, সমগ্র জাতির আত্মা সেখানে মূর্ত হয়ে উঠে। সাহিত্যিক মহাকাব্যের ক্ষেত্রে দেখা যাবে জাতির আর্থিক এবং পারমার্থিক গৌরবময় অধ্যায় অতিক্রান্তির পর যে অংশটুকু স্থায়ী সম্পদরূপে জীবনে বলাধান ক[illegible]তার সাহিত্যিক প্রতিমার দৃঢ়পিনদ্ধ ঋজুরূপ বিশিষ্ট কবিপ্রতিভার স্পর্শে মূর্ত হয়ে উঠে। সেখানে জাতির আত্মা নয়—উর্দ্ধচারীচেতনার অভিব্যক্তি ঘটে। এর স্বপক্ষে বাওরার সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে—"Literary epic if we judge by its best example

flourishes not in the heyday of a nation or of a cause, but in its last days or in its aftermath···Periclean Athens, Elizabethan England. France under Louis XIV, had their own superb literature but not literary epic."

[From Virgil to Milton.
Some characteristics of Literary Epic
C. M. Bowra.]

আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সরলতা এবং প্রত্যক্ষতা উভয় মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু পার্থক্যও রয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের সরলতা এবং প্রত্যক্ষতা নিসর্গধর্মী ভাগবতী সৃষ্টির অনুরূপ আর সাহিত্যিক মহাকাব্যের গঠন পারিপাট্যে শিল্পীর সচেতনতা অভিব্যক্ত। এই মহাকাব্যে উপকাহিনী কেবলমাত্র কলেবর বৃদ্ধির জন্য বা "Variety of interest"-এর জন্য যুক্ত হয় না। উপকাহিনীর যোজনা মূলকাহিনীর রসনিষ্পত্তির নিমিত্তকারণ রূপে করা হয়, নাটকীয় বিশ্রান্তির অবসর দেয়। এক কথায় মূলকাহিনীর সঙ্গে অখণ্ড তাৎপর্যসূত্রে উপকাহিনী গ্রথিত করা হয়। এখানে প্রতিটি শব্দ নির্বাচন, অলঙ্কারাদির প্রয়োগ অত্যন্ত সচেতনভাবে করা হয়; কারণ ন্যূনতম ত্রুটি কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। এই মহাকাব্যেও 'grand style'-এর সূত্রে 'grandeur' এবং ঘটনা নির্বাচনের Lordliness' থাকবে এবং পরিণামে তা হবে 'sublime'।

য়ুরোপে মহাকাব্যকে heroic poetry বলা হয়েছে। আমাদের ভাষায় তাকে বলা যেতে পারে বীরকাব্য বা শূরকাব্য। সেখানকার মহাকাব্যের উপজীব্য দেশজয় বৈরনির্যাতন বিপদসঙ্কুল নৌযাত্রা ইত্যাদি। বীরত্বের বহির্মুখ অভিব্যক্তি ভারতীয় মহাকাব্যে দেখা যায় না। এই কারণে কোনও কোনও সমালোচক ভারতীয় মহাকাব্যে "হাস্যকর অসঙ্গতি" আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা যদি পাশ্চাত্যানুরূপ অস্ত্রঝনৎকারকে মহাকাব্য বিচারে absolute মান বলে না ধরে একটু তলিয়ে দেখেন তাহলে নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে বীরত্ব ব্যাপারটা নিছক অস্ত্রঝঞ্ঝনা বা বৈরনির্যাতনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আত্মত্যাগের মধ্যে প্রবৃত্তি দমনের মধ্যেও বীরত্ব [illegible] এবং তা অন্তর্মুখ বলে তার নেত্রপ্রতিঘাতী ঔজ্জ্বল্য নেই। কিন্তু তাই বলে তার শৌর্য কম নয়। এই ব্যাপকার্থে ভারতীয় মহাকাব্য বীরকাব্য বলে অভিহিত হতে পারে।

মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে দুইশ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে

প্রভূত পার্থক্য আছে ঠিকই তৎসত্ত্বেও উভয়ক্ষেত্রে গৌরব সমুন্নতি (sublimity) এবং তদনুরূপ গুরুগম্ভীর আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর রাজোচিত মহিমা অবশ্যই থাকতে হবে।

ব্যঙ্গ মহাকাব্য :—মহাকাব্যের মহৎ ভাবাবহ সৃষ্টি কবি প্রতিভা সাপেক্ষ। ঐরূপ প্রতিভা ব্যতিরেকে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস মহাকাব্যের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। তাতে নিয়মের দাসত্ব থাকে—কিন্তু বশ্যতা নয়। সহৃদয় প্রসন্ন চিত্তে নিয়ম মানা এক জিনিস—অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা অপর বস্তু। অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা হৃদয় সংস্পর্শ লেশহীন, স্বভাবতঃই চিত্তবিস্ফারের বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এইরূপ পরিবেশে ব্যঙ্গরসিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু অবলম্বনে, ছদ্মগাম্ভীর্যে বিদ্রূপাত্মক মহাকাব্য রচনা করেন। এর ফলে পাঠকচিত্ত হাস্যকৌতুকের পথে একটু স্বস্তি বোধ করে। এর লক্ষ্য থাকে দুইটি, (ক) মহাকাব্যের প্রতিধ্বনিকে ব্যঙ্গ করা (খ) মহৎ আকাঙ্ক্ষার গুরু গুরু ধ্বনিস্ফোট অথচ বাস্তবে তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার মতো কর্মশক্তির দৃঢ়তার অভাব বা তদনুরূপ দায়িত্ব (risk) নেওয়ার অনীহাকে ব্যঙ্গ করা। উপর্যুক্ত দুইটি বিষয়কে ভিত্তি করে ব্যঙ্গ মহাকাব্য রচিত হয়।

আদিমতম মহাকাব্য হোল Batrachomyomachia। এই কাব্যটি অসমাপ্ত এবং হোমারের নামে প্রচারিত হয়েছিল। আমাদের মনে হয় কাব্যটির রচনাকাল হোমারের পরবর্তী হওয়া সম্ভব। পরবর্তীকালে পিউরিটানদের ব্যঙ্গ করে আলেকজাণ্ডার পোপ লিখেছেন,—'The Rape of the Lock'। বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যকে ব্যঙ্গ করে জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখেছেন "ছুছুন্দরী বধ" কাব্য দেশোদ্ধারের অন্তঃসারশূন্য প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত উদ্ধার' কাব্যে।

আধুনিক যুগ ও মহাকাব্য :—শিল্পসৃষ্টির কালসাপেক্ষতার কথা পূর্বেই বলেছি। এটাও লক্ষ্য করেছি মহাকাব্য রচনার মূলে সামষ্টিক চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রধান। ব্যক্তিকতার সাধারণীকৃতি শিল্পে ঘটলেও সামষ্টিক চেতনার সঙ্গে তার বিলক্ষণ পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটা এইভাবে নিদেশ করা যেতে পারে। মহাকবি আত্মগত রসকল্পনায় বস্তুসকলকে মণ্ডিত করেন না,—তিনি দেশ ও জাতির আত্মার গহনে ডুব দিয়ে নিজের হৃদয়বীণাকে তারই সুরের সঙ্গে জুড়ে দেন, ফলে তাতে যে সুর ঝঙ্কৃত হয় তাতে সমষ্টির প্রাণ স্পন্দনের অনুরণন শোনা যায় অর্থাৎ বস্তুর রসসত্তায় নিজেকে মণ্ডিত করেন। তাঁর সৃষ্টি Objective। পক্ষান্তরে আধুনিক কবি আত্মগত রসকল্পনায় বস্তুকে দেখেন।

তাঁর নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগার কথাকে সৃষ্টি নৈপুণ্যের গুণে অপরের হৃদয়ের সামগ্রী করে তোলেন। তাঁর দৃষ্টি subjective। ফলে মহাকাব্য রচনা সম্ভব হচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ বিচিত্র ভাব সংঘাতে জীবন আজ খণ্ডিত। আদি মধ্য অন্ত যুক্ত নিটোল বলয়ীকৃত রূপ আজ আপেক্ষিক অর্থে দৃষ্টি বহির্ভূত। মানুষের জীববৃত্তির নিরাবরণ বিস্ময়কর প্রকাশ যা পাপ পুণ্যের উর্দ্ধে নিজের শক্তির মহিমাতে মহনীয়, তার অভিব্যক্তি সভ্যতার জটিলতার পুটপাকে পড়ে খণ্ডিত হয়ে পড়েছে। এহেন পরিবেশে কবি শিল্পী মহাকাব্য রচনার প্রেরণা পাচ্ছেন না। বরঞ্চ দৃষ্টি পড়েছে ঘাসের ডগার একটি শিশির বিন্দুর কমনীয় সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার দিকে।

তৃতীয়তঃ গদ্যের অভাবনীয় উৎকর্ষ কাব্যের ক্ষেত্রকে গ্রাস করেছে। মহৎ উপন্যাসের ব্যাপ্তির মহিমার মধ্যে মহাকাব্যের স্বাদ আজ পরিস্ফুট। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "গোরা" টলষ্টয়ের 'War and Peace' স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও স্বীকার্য, যুগতাড়নায় ঐ জাতীয় উপন্যাস রচনার পাদপীঠও বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করেছে। তাই আজ আর মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয়।

॥ ট্র্যাজিডি ও মহাকাব্য ॥

আমরা পূর্ববর্তী দুইটি অধ্যায়ে ট্র্যাজিডি এবং মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন উভয়ের মধ্যে তুলনা করবার অবসর এসেছে। আমরা বক্ষ্যমান নিবন্ধে ট্র্যাজিডি এবং মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করব।

প্রথমে দেখা যাক উভয়ের ভিতরে ঐক্য কোথায় আছে :—

(ক) মহাকাব্য এবং ট্র্যাজিডি দুটোই গুরুগম্ভীর কাহিনীর শিল্পরূপ।

(খ) মহাকাব্য এবং ট্র্যাজিডি দুটোই একবৃত্তময়, দুটোরই প্রকাশ হবে ছন্দোময়।

(গ) কাহিনী উভয়ক্ষেত্রেই আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত নিটোল এবং একমুখীন হবে।

(ঘ) মহাকাব্য এবং ট্র্যাজিডির উপস্থাপনায় লেখক হবেন নৈর্ব্যক্তিক।

(ঙ) উভয় ক্ষেত্রে ঘটনা সংবেগের তীব্রতা থাকবে।

এবারে উভয়ের পার্থক্য দেখা যাক :—

(ক) ট্র্যাজিডি দৃশ্য কাব্য। জীবনকে দর্শনীয় করবার আবেগ থেকে তার সৃষ্টি। ঘটনার ক্রিয়মাণ রূপ ট্র্যাজিডির উপজীব্য। পক্ষান্তরে মহাকাব্য বিবৃতি মূলক এবং শ্রব্য।

(খ) ট্র্যাজিডিতে গান এবং দৃশ্যের যোজনার অবকাশ আছে। মহাকাব্যে এমত অবকাশ নেই।

(গ) মহাকাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজিডির পার্থক্য হোল বিশালতায়। কারণ ট্র্যাজিডি যেহেতু দৃশ্য সেইজন্য একই সময়ে অনুষ্ঠিত বহু ঘটনার উপস্থাপনার সুযোগ নেই, ফলে প্রাসঙ্গিক ঘটনাকে উপস্থাপন করতে হয়। মহাকাব্যে সেই রকমের বাধা নেই। সব কিছুকে গ্রাস করবার ক্ষমতা তার আছে।

(ঘ) ট্র্যাজিডিতে অনুভাবের প্রত্যক্ষীকরণ ঘটে, মহাকাব্যে তাকে অনুমান করে নিতে হয়। অবশ্য ট্রাজিডি কেবল পাঠ করে আস্বাদন করা যেতে, পারে, কিন্তু তার অভিনীত রূপ অভিনয় নৈপুণ্যের ফলে যে রসাবেদনে সক্ষম, পাঠের সঙ্গে তার মাত্রাগত (তীব্রতার দিক থেকে) ভেদ থেকে যায়।

(ঙ) Sublimity উভয়ের মধ্যেই আছে। তবে ট্র্যাজিডির sublimity গুণগত, মহাকাব্যের sublimity আকারগত (structure) এবং গুণগত, উভযতঃ। মহাকাব্য কাযমনোবাক্যে মহান।

এতৎ সত্বেও অ্যারিষ্টটল ট্র্যাজিডিকে “higher form of art” বলেছেন। এই ব্যাপারে মতভেদ আছে। যাঁরা মহাকাব্যের পক্ষে কথা বলেছেন তাঁরা বলেন ট্র্যাজিডি অভিনীত না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্ণ রসাস্বাদন হয় না। অভিনেতার সাহচর্যে দর্শক রসাস্বাদন করেন। তার আবেদন স্থূলবুদ্ধি দর্শকের কাছে। পক্ষান্তরে মহাকাব্য পাঠ করে কেবলমাত্র কল্পনায তার রসোদ্বোধ ঘটতে পারে। কাজেই তার আবেদন সূক্ষ্ম রুচির কাছে।

অ্যারিষ্টটল এই কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন মহাকাব্য পাঠ কালেও স্বগত অঙ্গভঙ্গী এসে পড়ে। ট্র্যাজিডি পাঠে কেবল কল্পনায় তার রসোদ্বোধ ঘটে। এতদ্ব্যতিরেকে ট্র্যাজিডিতে ছয়টি উপাদানের একান্বয় থাকে এবং সংকীর্ণ পরিসরে রসনিষ্পত্তি ঘটে বলে তার রস-সংবেদনা তীব্রতর। নাটক রচনায় ঘটনার দৃশ্যরূপ দেওয়ার জন্য সংশ্লেষণী বুদ্ধির প্রয়োজন হয়—বিবৃতিতে তা হয় না, বিবৃতি সরল মানসিক ব্যাপার। তাই ট্র্যাজিডি হোল “higher form of art।”

আমাদের মনে হয় এই বিচার বহিরাঙ্গিক। সাহিত্যের বিচার হবে রসের কষ্টিপাথরে। রসনিষ্পত্তিতে সার্থক হোলে সৃষ্টি সার্থক। এইক্ষেত্রে যে কোনও সৃষ্টি নিজস্বক্ষেত্রে স্বরাট এবং স্বে-মহিম্নি। এই প্রসঙ্গে আমাদের ম্যাথু আর্নল্ডের উক্তি মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন,—"For supreme poetical success more is required than the powerful application of ideas to life; it must be an application under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty."—জীবনসত্যের রসাভিব্যক্তি যে কোনও আধারে ঘটুক না কেন তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই। কাব্যে আমরা অহং অনুবিদ্ধ অথচ অহং নিরপেক্ষ চির বিস্ময়কর সত্তাকে অনুভব করি। এই অনুভূতি মহাকাব্যের আশ্রয়ে বা ট্র্যাজিডির আশ্রয়ে উদ্দীপিত হয়ে সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করে জীবনসত্যের স্বাদ যদি দিতে পারে তাহলে কোনটা 'higher form of art' সে তর্ক অবান্তর বলে পরিত্যক্ত হতে পারে।

॥ গীতি কাব্য ॥

ইংরেজীতে গীতি কবিতাকে বলা হয় Lyric। Lyre কথা থেকে Lyric কথাটির উৎপত্তি। গীতিপ্রাণ কবিতাবলী Lyre যন্ত্রের সাহায্যে গেয় ছিল। এই কারণে এই কবিতাবলীকে বলা হয়েছে Lyric, বাংলায় বলা হয়েছে গীতি কবিতা।

গীতি কবিতা সঙ্গীত-ধর্মী হলেও বিবর্তনের সূত্রে সঙ্গীতের সঙ্গে ঐ কবিতার সূক্ষ্ম পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই পার্থক্যটুকু অনুধাবনযোগ্য। কথাচয়নের ব্যাপারে সঙ্গীতকারের হাত পা বাঁধা। সুরের প্রয়োজনে তাঁকে শব্দ নির্বাচন করতে হয়, তাই স্বভাবতঃই সুরাত্মক, সহজে উচ্চার্য শব্দ চয়নের দিকে তাঁর নজর থাকে। এখানে সুরেরই প্রাধান্য। কথা, ছন্দ, বাস্তবতার আলেখ্য কোনও কিছুকে আশ্রয় না করে সুরের বিচিত্র বিস্তার আত্মার গভীরে যে অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ তোলে তা বিশ্বচিত্ততার নিঃসীম অবকাশের ব্যাপ্তিতে অনধিগম্য। গীতি কবিতায় কথারই প্রাধান্য। কথা ছন্দে বিধৃত হয়ে আলঙ্কারিক পরিভাষায় যখন ধ্বনি হয়ে উঠে, বিশিষ্টভাবে সুডৌল বাণীমূর্তি লাভ করে, তখন

তাকে বলি কাব্য। কাব্যে যখন কবির ব্যক্তিচিত্তের অভিব্যক্তি ঘটে তখন তাকে বলা হয় গীতি কবিতা। সঙ্গীত শুধু চলে, কবিতা চলে এবং বলে। সঙ্গীতে একটি ভাবেরই প্রাধান্য, তারই পুনরাবৃত্তিতে, স্বরগ্রামের লীলা-বৈচিত্র্যে সেই ভাবকেই গভীর করে তোলা হয়। পক্ষান্তরে গীতি কবিতায় ভাবের বৈচিত্র্য সম্পাদনের অবসর আছে। এখানে প্রাসঙ্গিকক্রমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা বলে রাখা ভাল। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজ্যে কথার উপরে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—"তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।" তিনি আরও বলেছেন,—"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুক্ত-পুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে সরিক বলে মানতে নারাজ। বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল, মিলনের পক্ষপাতী।" এক কথায় বলা যেতে পারে সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ সেখানে একাত্মক। এরা সামরস্যে অবস্থান করে। অর্থাৎ কথা এবং সুর অবিভাজ্য।

গীতিকবিতা আত্মভাব প্রধান। জীবন বা জগৎ ব্যাপারের সংস্পর্শে এসে কোনও বিশেষ মুহূর্তে কবিচিত্তে যে ভাবের দোলা লাগে বা একান্ত নির্জনে কোনও স্মৃতির রোমন্থনে চিত্ত ভাবোদ্বেল হয়ে উঠে তাকেই কবি বিশ্বচিত্ততার অনুসারিতায় ঝঙ্কৃত করেন ; ফলে তা সকলের অনুভূতিকে সার্বজনীন ঐক্যের প্রসাদ গুণে আবিষ্ট করে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন কেবল বক্তার সম্পদ হলেই চলে না, তাই বলা হয়েছে,—"Poetic genius is the power of seeing something and communicating certain kinds of truth by embodying in cencrete ideas."

তাহলে দেখা যাচ্ছে গীতি কবিতায় তত্ত্ব নয়, তথ্য নয় কবির সত্যানুভূতির প্রকাশ ঘটে। এবং তার জন্য উপযুক্ত রূপ নির্মাণ করতে হয়। কারণ ঐ রূপের আধারে সত্যের প্রকাশ ঘটে। তাই গীতি কবিতা রচনায় শব্দ নির্বাচনে, অলঙ্কারাদি প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন অবশ্য কতব্য। বিহারীলালের ভাবোচ্ছ্বাস ছিল কিন্তু রূপ নির্মাণে ঔদাসীন্য ছিল তাই তাঁর কবিতা মাঝপথে মার খেয়েছে। "হৃদয়ে দেখি কিন্তু দেখাতে পারি না" সাহিত্য তত্ত্বের বিরোধী। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথে এতদুভয়ের

সার্থক সম্মিলন ঘটেছে বলে তিনি সার্থক গীতি কবি। এইবার উদাহরণ নিয়ে সার্থক গীতি কবিতার স্বরূপ বোঝা যাক,—

"দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্র রেণু, লীলাপদ্মহাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে॥"

[স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।]
কল্পনা।

এই কাব্যাংশে কোনও তত্ত্ব নেই, ব্যবহারিক জীবনের সত্য নেই। একটি বিশেষ ভাবানুভূতির মুহূর্তে বিংশ শতাব্দীর কবি কালিদাসের যুগের পূর্বজন্মের প্রিয়ার অভিসারে বেরিয়েছেন। অনুভূতির আন্তরিকতা (sincerity) এবং প্রকাশ নৈপুণ্য চিত্তচমৎকারী হয়ে আমাদেরও বাস্তবের কঙ্করময় জীবন থেকে অতীত জীবনের সৌন্দর্যলোকে উধাও করে নিয়ে যায়—বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসে আবিষ্ট করে। অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন কয়েকটি ফুল দেখে বলেন,—"I saw ten thousands at a glance" তখন তাতে তথ্য থাকে না, কবির গূঢ় আনন্দানুভূতির সত্য প্রকাশিত হয়। এইজন্য গীতিকবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"Intense emotion coupled with an intense display of imagery"।

ঐ 'Intense emotion' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। মৌহূর্তিক আবির্ভাবে সত্যের রূপ দেখিয়ে, ক্ষণিককে নিত্যলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে সরে যায়। তাই গীতি কবিতা আকারে বড় হয় না; সমালোচক এইজন্য বলেন,—"...the intense feeling the ecstasy which goes to make a lyric does not last long. It blazes upto a white heat and dies away in a moment"—ঐ মুহূর্তের মধ্যেই কবিদৃষ্টিতে অজ্ঞাতপূর্ব ভাবসমূহ উদ্ভাসিত হয় এবং "airy nothing" "local habitation and name" পরিগ্রহ করে। আমরাও কবির অনুভূতির

অংশভাক হয়ে পড়ি। তাই গীতি কবিতা "The poetry of self delineation and self expression" হয়েও আবেদনে হয় বিশ্বপ্লাবী।

গীতিকবি বস্তুর আনুগত্য স্বীকার করেন না—নিজের ভাবের অনুগত করে বস্তুকে দেখেন। ঐ দৃষ্টির সামনে বস্তুর যথাস্থিত রূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়—যদিও তা একেবারে বস্তু নিরপেক্ষ নয়। অর্থাৎ গীতি কবি রোম্যান্টিক। তাই একই বস্তু এক একজনের কাছে এক একভাবে প্রতিভাত হয় এবং তদনুযায়ী তার রূপসৃষ্টি ঘটে। যেমন Skylark-এর উপরে শেলী এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুইজনে কবিতা লিখেছেন কিন্তু রসের পার্থক্য আছে।

গীতিকবিতা বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। তত্ত্ব নির্ভর, ভক্তিমূলক, স্বদেশপ্রীতিমূলক, প্রেমনির্ভর, প্রকৃতি বিষয়ক। কিন্তু মূলতঃ দেখতে হবে তা কবিতা হয়েছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ গীতি কবিতার মধ্যেও ভাব সমুন্নতি থাকতে পারে। রূপবন্ধের হেরফেরে গীতিকবিতার পরিচিতির হেরফেরও দেখা যায়। এবার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের বলাকা পর্ব থেকে কবিতা হয়েছে তত্ত্বনির্ভর কিন্তু তত্ত্বকে ছাপিয়ে আছে কাব্যরস, রামপ্রসাদের পদাবলী ভক্তিনির্ভর গীতি কবিতা, অক্ষয় বড়ালের 'জন্মভূমি', দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' স্বদেশপ্রেমমূলক গীতি কবিতা, 'চর্যাপদ' ধর্মমূলক, নজরুলের 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিগুরুর 'বৈশাখ' প্রকৃতিমূলক, জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' প্রেমমূলক গীতিকবিতা। মোহিতলালের 'কালবৈশাখী', রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী', 'বর্ষশেষ' কবিতার ভাব সমুন্নতি লক্ষ্যনীয়।

মোটের উপর আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কবির গাঢ় ব্যক্তিক অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, শ্রতিমধুর ছন্দে স্বল্পতম পরিসরে চিত্তচমৎকারী ভাষায় সার্বজনীন চিত্তের অনুসারিতায় ঝঙ্কৃত হয়ে রোম্যান্টিক মায়াজাল সৃষ্টি করলে তাকে গীতি-কবিতা বলে।

আমরা এখন সংক্ষিপ্তাকারে বাংলা কাব্যে গীতি কবিতার বিবর্তন ধারা আলোচনা করব। বাংলা কবিতার মেজাজ গীতিধর্মী। বাংলা কাব্যের জন্ম লগ্ন থেকেই গীতি-কবিতার সূত্রপাত হয়েছে। সেই ধারা বাঁকে বাঁকে মোচড় খেয়ে আজও অব্যাহত ভাবে চলেছে। এই ধারাটিকে মোটামুটি ভাবে দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। (ক) প্রাগাধুনিক—উনবিংশ শতাব্দীর, বিশেষ কবি বিহারীলালের আবির্ভাবের পূর্বলগ্ন পর্যন্ত। (খ) আধুনিক—বিহারীলালের পরবর্তী কাল।

প্রাগাধুনিক কালের বৈষ্ণব কবিতায় গীতি কবিতার চরমোৎকর্ষ ঘটেছে।

বৈষ্ণব গীতিকবিতার সঙ্গে আধুনিক গীতিকবিতার মৌলিক তফাৎ রয়েছে। বৈষ্ণব মহাজনেরা কবিতা লিখেছেন ষড়গোস্বামীর দার্শনিক নির্দেশ শিরোধার্য করে। সেখানে গোষ্ঠী-মনোভাবের প্রাধান্য ঘটেছে। বৈষ্ণবকবিরা যা কিছু বলেছেন সবই রাধাকৃষ্ণের জবানীতে। গ্রীষ্মের তাম্রাভ আকাশ, বর্ষার সজলজলদভারে আনত মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দররূপ, শরতের কৌমুদীপ্লাবন, বাঁশঝাড়ের ঝরকার রন্ধ্রপথে ভীরু জ্যোৎস্নার সলজ্জ চাহনি, বাতাসের দৌরাত্ম্যে পুষ্পবনের লজ্জাললাস উচ্ছ্বাস, বসন্তের অশোক পলাশের রক্তোচ্ছ্বাস কবিচিত্তকে স্পর্শ করলেও তাকে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের লীলার পরিপুষ্টির উপাদান হিসেবে দেখেছেন, অর্থাৎ ঐ প্রাকৃতিক সম্ভার রাধাকৃষ্ণের মনে কি ভাবের উদ্দীপন করে তাই তাঁরা উপভোগ করেছেন। ফলে কবির সঙ্গে পাঠকের যোগ সরাসরি নয়—রাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থতায়। এতে তীব্রতা ক্ষুণ্ণ না হলেও—প্রত্যক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বাংলার লোকসাহিত্যেও কবি-মনের চাইতে সমাজ-মন মুখ্য হয়ে উঠেছে। যদিও মাঝে মধ্যে ব্যক্তিচিত্ততার স্পর্শ পাওয়া যায়। একে গোষ্ঠীমন থেকে ব্যক্তিমনে উত্তরণের ইঙ্গিত বলা যেতে পারে।

আধুনিকযুগে এসে ব্যক্তিচিত্ত প্রধান হয়ে উঠেছে। কবির সঙ্গে পাঠকের যোগ এখানে প্রত্যক্ষ। কবির ভালোলাগা, মন্দলাগার ব্যাপারটি সাধারণীকৃত হয়ে সহৃদয়ের কাছে আবেদন রেখেছে। গীতিকবিতা এখান থেকে আত্মপ্রধান হয়ে উঠেছে—"awakening of the self" বিহারীলালের কাব্যে স্পষ্টরেখ হয়ে গীতি কাব্যে নতুন সুরযোজনা করেছে। এই সুর নানা বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট হয়ে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

॥ সাহিত্যে-ক্লাসিকতা ও রোম্যাণ্টিকতা ॥

ক্লাসিকতা এবং রোম্যাণ্টিকতা কথা দুইটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ নেই। জোর করে প্রতিশব্দ তৈরী করবার ঝুঁকি নেওয়াও সঙ্গত নয়, কারণ তাতে অর্থসমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই কথা দুইটিকে অবিকৃত অবস্থায় আমরা ব্যবহার করব।

ক্লাসিকতা এবং রোম্যাণ্টিকতা স্রষ্টার দুটি বিশিষ্ট মনোভঙ্গী। ক্লাসিক মনোভঙ্গী বলতে বোঝায় সুশৃঙ্খল নিয়মের অনুবর্তিতা। ক্লাসিক শিল্পী জগৎ ও জীবনকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত, সুস্থির বুদ্ধি বিবেক সম্মত আদর্শ অনুভাবনায় প্রত্যক্ষ করে শব্দ ও

অর্থের স্বচ্ছ মুকুরে প্রকাশ করেন। পরিবর্তনশীল নশ্বর জগতে ধ্যান ধৃত কোনও একটি স্থায়ী সত্তার উপর অটুট আস্থা এই কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য। সৌষম্য, সুসঙ্গতি এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এক কথায় সমগ্রতা ও সুস্পষ্টতা ক্লাসিক সাহিত্যের লক্ষণ। কবি মনের চাইতে বিষয়ের প্রকাশের দিকে ক্লাসিক কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ক্লাসিক সাহিত্য বস্তুনিষ্ঠ। ক্লাসিক কবির ধ্যেয় হোল রূপ। এই রূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এর জন্য পাঠকের sensible imagination খুব বেশী দরকার হয় না। কেন না সবই সেখানে প্রত্যক্ষ। ক্লাসিক কবির কাছে প্রাতিস্বিকতার কোনও মূল্য নেই, বরঞ্চ তাঁর পক্ষে সেইটি বাধা। এর সঙ্গে মিশে থাকে ঐতিহ্য বোধ এবং গৌরবানুভূতি। কবি এখানে বস্তুরসে তন্ময় হয়ে যান। প্রকাশ যেহেতু ভাস্কর্য ধর্মী, ঋজু, সরল এবং প্রত্যক্ষ ও গাম্ভীর্য মণ্ডিত সেই জন্য ক্লাসিক কাব্যের সম্পদ ওর গৌরব-সমুন্নতি (sublimity)। ক্লাসিক কবি যে নিয়মের কঠোর শৃঙ্খলে জীবন ও জগৎ বাঁধা বলে মনে করেন তার ব্যতিক্রমে পাপ জেগে ওঠে বলে কল্পনা করেছেন, এব তাই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জীবনকে গ্রাস করে। গ্রীক কাব্যে ঐ পাপের নাম হয়েছে নেমিসিস বা ফিউরী।

রোম্যান্টিক মনোভঙ্গী এর বিপরীত। রোম্যান্টিক কোনও নিয়মের শাসন মানেন না। এই শ্রেণীর কবি আত্মগত কল্পনায় জীবন ও জগতকে অধিগত করে তার বেদী-চূড়ায় আসন পাতেন। রোম্যান্টিকের দৃষ্টিতে সব অর্থসমৃদ্ধ প্রচেষ্টার মূল উৎস ব্যক্তিত্ব বোধে। প্রাতিস্বিকতার মূল্য তাঁর কাছে বেশী। তাঁর সৃষ্টি subjective। ক্লাসিক রুচি-দর্শনের আদর্শ গাণিতিক প্রত্যয়ে—রোম্যান্টিকের জৈব অভীপ্সায়। রোমান্টিক কবি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসে, অপ্রাপনীয়ের উদ্দেশ্যে গতানুগতিকতার বেড়া ভেঙে নবসৃষ্টির দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর চোখে থাকে বিস্ময়ের মোহাঞ্জন। এই কারণে অতিপরিচিত বস্তুও বিস্ময়কর সৌন্দর্যের আকর হয়ে উঠে। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। সূর্যালোকের প্রখরতায় অতি নিকটের বস্তু রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে নয়ন ও মনকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ঐ একই বস্তু রাতের আলো-আঁধারিতে মোহময় হয়ে উঠে। কারণ রাতের পরিবেশ ও বস্তুর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। দূরের একটি মোহ আছে, সৌন্দর্য আছে। তাই সমালোচক পেটার বলেছেন রোম্যান্টিসিজম্ হোল—"Addition of Strangeness to beauty" বিস্ময়ের উদ্বোধন হয় বলে "Renaissance of wonder" বলে কোনও সমালোচক অভিহিত করেছেন। আমরা দেখেছি বিস্ময়ের উদ্বোধনের মূলে রয়েছে দূরত্ব। ঐ দূরত্ব পরিচিতর গায়ে অপরিচিতর কুহেলী মাখিয়ে দেয়,—দ্রষ্টা এবং বস্তুর মাঝে

কল্পনার অবসর সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়—"Distance lends enchantment."। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটি রোম্যান্টিক। দিনের সূর্যালোকে যা প্রত্যক্ষ এবং রূঢ়, রাতে তাই হয়ে উঠে মোহময়। পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ তার অতীতের কাহিনী, শুস্তার জল এই সব কিছুর সঙ্গে রাতেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে রোমান্স সৃষ্টির ক্ষেত্রে। রাতের স্তিমিত দীপালোকে কালেক্টার সব কিছুর ভাবানুষঙ্গে অতীত যুগে ফিরে যায়, নিজেকে মনে করে শাহান্ শাহ্। পাগলা মেহের আলির চীৎকারে তার মোহভঙ্গ হয়। তখন "চাহিয়া দেখিলাম সকাল হইয়াছে।"

মোটের উপর বলা যেতে পারে নিটোল, নিষ্কলুষ সৌন্দর্যের জন্য গভীর আর্তি, অধরাকে ধরবার ব্যাকুলতা, বাস্তব জীবনের খণ্ডতাকে কল্পনায় অখণ্ড ভাবে পাওয়ার ব্যাকুলতা শেলী যাকে বলছেন,—"devotion to something afar from the sphere of our sorrow" রোম্যান্টিকতার লক্ষণ। তাই এর প্রকাশ-ভঙ্গিতে শব্দের ব্যঞ্জনার উপর ভিত্তি করতে হয়। এখানে সামান্য কথা বলা হয় ভাষায়, বেশির ভাগ বলা হয় আভাসে। কবি বলেন একছত্র পাঠকের কল্পনার উপরে ছেড়ে দেন দশছত্র। একে বলা যেতে পারে,—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

. ক্লাসিকতা এবং রোম্যান্টিকতার সম্পর্কটি একটু বিচার করে দেখা দরকার। ক্লাসিকতা এবং রোম্যান্টিকতা সাহিত্য জগতের দুই মেরুর অধিবাসী হলেও এদের পারস্পরিক সম্পর্কটি অহি-নকুলের মতো নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এতদুভয়ের সম্পর্ক ঋতু চক্রাবর্তনের মতো। ক্লাসিক যুগের কঠোর শৃঙ্খলার নিয়মানুবর্তিতায় পাঠক চিত্ত যখন হাঁপিয়ে উঠে তখন রোম্যান্টিক কাব্যের মুক্তাকাশে পক্ষবিস্তারের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। তেমনই আবার রোম্যান্টিক কবিতার অতি প্রাদুর্ভাব যখন শুধুমাত্র শব্দ-ব্যায়ামে পর্যবসিত হয়, বায়ুশূন্য-লোকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে পাঠক তখন দৃঢ়ভিত্তিক পাদপীঠ খুঁজে পেতে চায়। তাই এক রকমের জৈব চাহিদা থেকেই যথাক্রমে ক্লাসিক এবং রোম্যান্টিক কাব্যের চক্রাবর্তন ঘটে থাকে। এতদ্ব্যতিরেকে রোম্যান্টিক কাব্যের উৎস রূপে ক্লাসিক কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। ক্লাসিক কাব্যে ভাব ও ভাষার দৃঢ় গাঁথুনি থাকে। স্বভাবতঃই তাতে শক্তি সঞ্চিত হয়। ক্লাসিক কাব্যের সংযমের প্রভাবও পরোক্ষ ভাবে ব্যক্তি চিত্তে সংক্রামিত হয়। রোম্যান্টিক কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন পূর্বোক্ত কাব্যের ভাব ও ভাষার কেন্দ্রীয় সংহতির শক্তিকে মুক্তি দেন। অর্থাৎ ক্লাসিক কাব্যে

যে শক্তি সংহত হয়ে থাকে রোম্যান্টিক কাব্যে তাই গীতিধারায় উৎসারিত হয়। এ্যাবারক্রোম্বি বলেন ক্লাসিকতা অটুট স্বাস্থ্য এবং রোম্যান্টিকতা হোল ব্যাধি। এই মন্তব্যে উভয় ধর্মের পরস্পর-সাপেক্ষতা স্বীকৃত হয়েছে। কারণ স্বাস্থ্য এবং ব্যাধি একই সঙ্গে বাস করে। একই দেহের রূপভেদ মাত্র। রোম্যান্টিকতা টাইফয়েডের মতো ক্লাসিকতার স্বাস্থ্যকে নিজের স্বাস্থ্যে-রূপান্তরিত করে নেয়।

যেহেতু ক্লাসিকতা এবং রোম্যান্টিকতার ভিতরে প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই সেইজন্য একই কাব্যে এদের সহাবস্থান দেখা যায়। কালিদাসের 'মেঘদূত' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 'প্যারাডাইস লস্ট'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমালোচকও বলেছেন,—"Classicism in England hardly ever shows itself in a state of absolute purity."—এবং আরও লক্ষ্য করেছেন ক্লাসিকতার মধ্যে রোম্যান্টিকতার প্রভাব,—"Sensibility, imagination, alyricism which the repressive action of culture cannot always reduce to correct limits, show through in a word, an image, a movement, an accent, with all the writers of the age." রোম্যান্টিকতার ভিতরেও কাব্যশৈলীতে ভাবসমুন্নতিতে ক্লাসিকতার ছাপ পড়ে। মোহিতলালের 'কালাপাহাড়' সত্যেন্দ্রনাথের 'মহাসরস্বতী' কবিতাদ্বয় তার নিদর্শন।

এখানে একটা প্রশ্নের সমাধান করে রাখা দরকার। প্রশ্নটি হোল এই যে, রোম্যান্টিকতার সঙ্গে আদর্শবাদের (Idealism) তফাৎ কোথায়? দুইটি মনোভঙ্গী বস্তুর যথাস্থিত রূপের পরিবর্তন ঘটায়। এহেন ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্দেশ করব কি ভাবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, আদর্শবাদে বস্তুর ভিতরকার যে সম্ভাব্য রূপ অথবা বস্তুর যা হওয়া উচিত সেই রূপটিকে পরিস্ফুট করা হয়। রোম্যান্টিকতায় বস্তুর গায়ে রহস্যের কুহেলি মাখিয়ে দেওয়া হয় সেখানে বস্তু থেকে মায়া সত্যতর হয়ে উঠে।

রোম্যান্টিকতার সূত্র ধরেই এই যুগে এসেছে স্যুররিয়ালিজম্। স্যুররিয়ালিজম্ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবসর এখানে নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবেশ, ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান, মার্কসীয় সমাজ বাস্তবতা সব কিছু মিলে চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। সাহিত্যের জগতে তার এলোমেলো প্রকাশ দেখা গেল 'ডাডাইজম্' নামে। এর উদ্গাতা ত্রিস্তান জারা। এ একরকমের নৈরাজ্যবাদ বটে। এখানে ভাব ও বস্তুর সারূপ্য-সাধন হয় নি। এরই পরিণতিরূপে এলো স্যুররিয়ালিজম্। এর স্বরূপ ব্যাখ্যাত

হয়েছে এইভাবে,—"a movement in French art and literature from about 1919 on, that aimed at drawing upon the sub-conscious and escaping the control of reason or any pre-conception" [Chambers]। এতৎ সম্পর্কে প্রথম ইস্তাহার ঘোষিত হোল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে বলা হোল,—"The magnetic fields, a periodical declares, Surrealism, a kind of waking dream state pure psychic automatism, by which it is intended to express verbally in writing or by other means, the real process of thought."

[The trend of modern poetry.
Surrealism. The new apoclypse. P. 214
by, Geoffrey Bullough.]

স্যুররিয়ালিস্টরা চাইলেন নির্জ্ঞান স্তরের ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ ভাবে যথাস্থিত ধরে দিতে। যুক্তির দিক থেকে এইটে সম্ভব নয়। কেন নয়? কারণ কাব্যে কোনও কিছুর অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কর্তাকে স্বীকার অবশ্যই করতে হবে। এবং সেখানে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ থাকতেই হবে। তাই "drawing upon the sub-conscious escaping the control of reason" সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ নির্জ্ঞান স্তরের ভাবনার জোয়ার ভাটা খেলে ঠিকই কিন্তু তা এলো মেলো। কাব্যে যদি সেই ভাবে তাকে রূপদান করা হয় এব যদি তা সম্ভব হয় তবে তা হবে অসম্বন্ধ প্রলাপ—সহিতত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। এই কারণে বলা হয়েছে,—"Such pure surrealism was probably very rarely, if ever achieved, the conscious mind always insists upon having some share in transmitting material to paper."

English literature of the 20th century. P. 207-8
by A. S. Collins.]

এই কারণে স্যুররিয়ালিজম্ ইংরেজী সাহিত্যে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। ইংরেজ কবিশিল্পীরা ঐ অসম্বন্ধতাকে স্বীকার করলেন না, অর্থহীনতা, প্রচলিত ধারার প্রতি উপেক্ষা স্বীকার করলেন না। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"The English Neo-Romantics did not however go all the way with the Sur-realists but felt rather that there was an inner logic or dream logic in the images that emerged from the sub-conscious mind

and that it was not the business of the poet to interpret those images intellectually (or at least to do so in the poem itself) but that the task of the conscious mind should be confined to rejecting those among the unconscious images presented to it which seemed trivial or in-coherent and to moulding the rest into a pleasing metrical shape."

[The modern writer and His world. P. 240.
by G. S. Fraser]

কাজেই দেখা যাচ্ছে স্যুররিয়ালিজম্ রোম্যান্টিকতার একটি শাখা এবং পক্ষান্তরে আধুনিক বাস্তবনিষ্ঠ জীবনে "re-affirmation of the Romantic principle" ঘটিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে বাস্তব জীবনের ভিতরে থেকে অবাস্তবতার জন্য যে আর্তি সাহিত্যসৃষ্টি মূলে তাই ক্রিয়াশীল। একেই বলেছি রোমান্টিকতা। এর অধিক বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

॥ সাহিত্যের বাস্তবতা ॥

"True history that never happened"

—George Bernard Shaw.

সাহিত্যে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের বিতণ্ডা এ আজকের কথা নয়। এই বাদবিতণ্ডা চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। এই তর্কের সমাধানকল্পে প্রাচীনেরা রসকেই একমাত্র প্রমাণ ধরে অগ্রসর হয়েছেন এবং বিচার করেছেন। পার্থিব জীবনের বাস্তবতার নিরিখে তার বিচার চলে না। কেননা ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতার কোনও ধ্রুব মান ঠিক করে দেওয়া যায় না। লৌকিক জ্ঞানে যা একের কাছে বাস্তব অপরের কাছে তা বাস্তব বলে গৃহীত হয় না। রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা তার অন্যতম নজীর। এক রাজনৈতিক মতবাদে দেশের উন্নতির পক্ষে যে পন্থা বাস্তব বলে বিবেচিত হয়, অপরের মতে সেইটি বাস্তব নয় বলে পরিত্যক্ত। অথবা বলা যেতে পারে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত একটি বস্তুগত ঘটনা। বস্তু হিসাবে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, মানুষের মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কিন্তু কবিশিল্পীর লেখনীতে তা রূপবৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষও তাকে বিচিত্র ভাবে দেখে নিজের মানসিক

প্রবণতানুযায়ী। কাজেই লৌকিক বাস্তব সকলের চিত্তকে ঐক্যের প্রসাদগুণে আবিষ্ট করতে পারে না। কারণ বাস্তবতা কথাটিই আপেক্ষিক—তার অন্য নিরপেক্ষ মূল্য লৌকিক জীবনে নেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসকেই নিয়ামক ধরে নেওয়ায় এই জাতীয় প্রশ্ন আমাদের বিব্রত করে না। সাহিত্যে যে কোনও রূপসৃষ্টি যখন স্পষ্ট করে আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে, স্থায়িভাবকে অভিব্যক্তি দান করে তখন তাকে বাস্তব বলে মানতে কোনও বাধা থাকে না, কারণ জীববৃত্তির ঐক্যে আমরা সকলে ঐক্য অনুভব করি। এর কোনও ব্যবহারিক অর্থ নেই, এতে জীবন সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান হয় না, কিন্তু,—"Tease us out of thought as doth eternity." আমাদের মনপ্রাণকে অসীমের অভিমুখীন করে, সীমাহীনতার মধ্যে মুক্তি দেয়। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা হচ্ছে ব্যক্তির আপন গণ্ডীকে ছাড়িয়ে বিরাটের মহাকাশে পাখা মেলা। দৈনন্দিন জীবন প্রতিটি ব্যক্তিকে 'প্রোকাস্টিয়ান বেডে' ফেলে প্রমাণ সাইজ বানানোর চেষ্টা করছে। মানুষের প্রথম বিদ্রোহ এই প্রাত্যহিকতার বিরুদ্ধে এবং সেইটাই সাহিত্য। মুমুক্ষুর বেদনায় সাহিত্যের জন্ম। তাই চাল-ডাল-তেলনুন আর চাকরী-ব্যবসায়-রাজনীতির ছকের বাইরেকার মুক্তির চিরকামনীয় মহাজীবনের প্রতি মানুষের অনিবার্য অভীপ্সার প্রতিচ্ছবি সাহিত্য। এর উপাদান ব্যবহারিক জগৎ। বাইরেকার জীবন ও জগৎ ব্যাপারের তরঙ্গাভিঘাতে কবির মনে সাড়া জাগে তাকে তিনি রসলোকে জারিত করে পরিমিতিত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং তা সর্বপ্লাবিতার গুণে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠে। ঐ গ্রাহ্যত্বই সাহিত্যের বাস্তবতা।

আমরা জানি সাহিত্যিকের সৃষ্টির মূলধন হোল মানস জগৎ। বস্তু স্রষ্টার মনে যে রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয় সেই রূপের সৃষ্টি নৈপুণ্যে তার সার্থকতা। একই বস্তু বিভিন্ন স্রষ্টার মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং স্রষ্টা তদানুগত্যে একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেন। একে তিনি যতটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারবেন ততটাই তা বাস্তব হয়ে উঠবে। এই বাস্তবতার নিরিখে বাল্মীকি, বেদব্যাস, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র সকলের জগৎ বাস্তব। তাই যদি না হোত বস্তুতান্ত্রিকতা বা ব্যবহারিক বাস্তবতার নিরিখে কালিদাসের কাব্য বা রামায়ণ-মহাভারত আজ আমাদের আর পরিতৃপ্ত করতে পারত না। কেননা আজকের বাস্তবতাবোধের সঙ্গে সেদিনকার বাস্তবতার বাচ্যার্থের নিরিখে কোনও মিল নেই। আজকের জীবনবিন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে কোনও রাজা দুষ্মন্তের পক্ষে কণ্বমুনির তপোবনে গিয়ে কোনও শকুন্তলাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। আবার কোনও দিনই কোনও শকুন্তলার পক্ষে স্বামী

প্রত্যাখ্যাতা হয়ে স্বর্গের পটভূমিকায় শিশু ভরতকে সিংহশিশুর সঙ্গে খেলতে দেওয়াও সম্ভব নয়, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনও অবাস্তব ব্যাপার। তবুও শকুন্তলা পাঠ করবার কালে এই সব অবাস্তব প্রশ্ন আমাদের বিব্রত করে না। কারণ সেখানে অনুভূতির সত্য রয়েছে,—সৃষ্টি রসধন্য হয়েছে। কাব্যে কোনও বিশেষ ঘটনার লৌকিক রূপ নয়,—ঘটনার সম্ভাব্য রূপ অভিব্যক্ত হয়, যা অলৌকিক। কাব্যকে বলা হয় 'লোকোত্তর'। তাই যা অলৌকিক তা লৌকিক বাস্তবতার মাপকাঠিতে ধরা যাবে না। তথ্যকে এখানে উপেক্ষা করা হয় না—'world of facts'-কে দিব্যানুভূতিতে নতুন করে আবিষ্কার করা হয় তাতে থাকে সত্যের স্পর্শ। তথ্যকে আশ্রয় করে সত্যের স্বাদ দেওয়াই সাহিত্যের লক্ষ্য। এর সত্যের নিরিখে সাহিত্য বাস্তব হয়ে উঠে।

এখন প্রশ্ন হোল সত্য বলব কাকে? তার স্বরূপই বা কি? এইটি নিয়ে দার্শনিক তর্কের অবকাশ আছে। তর্ককণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করেও মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে দর্শনে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে যে সত্যের প্রকাশ ঘটে তা খণ্ডিত। কারণ দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান যাকে আজ সত্য বলে ঘোষণা করে আগামীকাল নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কারে তাকে পরিত্যাগ করে। কাজেই সেই সত্য কালোত্তীর্ণ নয়। দ্বিতীয়তঃ এই সত্য বুদ্ধি-নির্ভর। আর বুদ্ধি প্রয়োজনের দাসত্ব করতে গিয়ে আবিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া বুদ্ধির মূলে ক্রিয়াশীল থাকে কৌতূহল। সে চারপাশের অসংখ্য অনিশ্চয়তার ভিতরে খেই হারিয়ে ফেলে, সভয়ে নিজেকে সংকুচিত করে নিতে চায়। তাই কালাতীত সত্যকে ধারণ করবার যোগ্যতা তার নেই। পরিপূর্ণ সত্য কি আমরা জানি না। তাই খণ্ড সত্য নিয়ে খুশি থাকি। আমাদের বক্তব্য, সত্য যদি পরিপূর্ণ হয় তাহলে তাকে খণ্ড করা চলে না। খণ্ডভাবে যেটা প্রতিভাত হয় তা দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতার প্রতিক্রিয়া মাত্র। পরিপূর্ণ সত্য থাকে আমাদের অনুভূতিতে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। দার্জিলিঙে দাড়িয়ে আমরা হিমালয়কে যতটুকু দেখি হিমালয় তার চাইতে অনেক বড়ো। তার বিরাটত্বকে আমাদের চোখের বিস্তারে আবদ্ধ করা অসম্ভব। তবু আমরা বলি হিমালয়কে দেখলাম, আসলে দেখি তার খণ্ডাংশকে। তবে কি আমাদের দেখা এবং বলার মধ্যে অসম্বদ্ধতা আছে? না, তা. নেই। ঐটুকু যে হিমালয়ের পূর্ণ রূপ নয় সেইটে আমরা বুঝি। কি করে বুঝি? কারণ হিমালয়ের পূর্ণ রূপ মনে বাসা বেঁধে আছে এবং তা আছে আমাদের অনুভূতিতে। অর্থাৎ সত্য-সম্পর্কে ধারণাটা থাকে অনুভূতিতে। তৃতীয়তঃ সত্য বক্তার অস্তিত্ব নিরপেক্ষ।

সাহিত্যে ঐ সত্যের প্রকাশ রসরূপান্তরিত হওয়ার অর্থ স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ হয়ে যাওয়া—স্বগত হয়েও তা পরগত। সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয়। এমন কি ভয়াল আর বীভৎস দৃশ্যও আনন্দ দেয়। ভয়ালতার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা নিশ্চয়ই আনন্দের নয়। অনুভূতিটা ঘনীভূত হলেই আনন্দ পাই। অর্থাৎ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে আমাদের মানসিক উত্তরণ ঘটে আনন্দলোকে। কারণ আমাদের সত্তায় তার সত্যকারের অস্তিত্ব আছে। এই কারণে বলা হয় সাহিত্যের সত্য কালোত্তীর্ণ এবং তা বাস্তবাধিক বাস্তব। কেননা সাহিত্যে প্রকাশিত অনুভবের সত্য এবং তা বক্তার অস্তিত্ব নিরপেক্ষ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের ঐতিহাসিক সত্য তাঁর কালে ছিল খণ্ডিত, মহাকালের পরিক্রমণ পথে খণ্ডকালের দৈন্যে দীর্ণ ছিল সেই মহৎ মহীয়ানের জীবনগাথা। বাল্মীকির দিব্যদৃষ্টি তাকে কাল থেকে কালান্তরের পূর্ণসত্যের সপ্তাশ্বরথে সূর্যের ভাস্বরতায় আকীর্ণ করে দিল অনুষ্টুপ ছন্দে। তাই রামচন্দ্র কোনও দিন রাজত্ব করেছেন কি না, জীবনগাথা কবির বর্ণনার সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলে যায় কি না, সেই সব প্রশ্ন অবান্তর। সত্য হোল, কবি রামায়ণে একটি ব্যক্তির জীবনকে অবলম্বন করে ত্যাগের ছায়াপথ ধরে সত্য হবার প্রযত্নকে রূপায়িত করেছেন, তার ভিতরে আছে ভাবের সত্য। কবির দিব্যদৃষ্টিতে খণ্ডের মিথ্যা পূর্ণের সত্যে পরিণত হয়। জীবনের সমগ্র রূপ অনুভূতির কেন্দ্রে মণ্ডলায়িত হয়ে ওঠে। এইটে যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ আনন্দ। আনন্দের প্রকাশকে বলে কাব্য। সত্যের স্পর্শ যেখানে নেই আনন্দের ভিত্ সেখানে আলগা। তা ছলনা মাত্র। মরীচিকা দেখার আনন্দ আছে ঠিকই, কিন্তু তা সাময়িক, তা খণ্ডিত—মরুস্থানের দেখা পেলে তা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। সত্যভিত্তিক আনন্দই শাশ্বত—সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটে। কবি মিথ্যার মোহ সৃষ্টি করেন না। সত্যের সাক্ষাতে কীটস বলেন,—

"Beauty is truth, truth beauty that is all
Ye know on earth, and all Ye need to know."

এই আনন্দের মাপকাঠিতে সাহিত্যের সুখদুঃখ, পাপ-পুণ্য, সুন্দর-কুৎসিত সবই সত্য এবং 'অধিকতর বাস্তব'। সত্যের ব্যত্যয় ঘটে তখনই যখন শিব

গড়তে বাঁদর গড়া হয়। আমাদের আলঙ্কারিকেরা এই বিষয়ে সাবহিত ছিলেন। তাকে তাঁরা বলেছেন অনৌচিত্য। আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন,—লৌকিক মানুষ নিয়ে যে কাব্য তাতে সপ্তার্ণব লঙ্ঘন প্রভৃতি ব্যাপারের অবতারণা বর্ণনামহিমায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন হলেও কাব্যত্ব হিসেবে নীরস। কারণ অনৌচিত্য। অভিনবগুপ্ত বললেন যে বর্ণনা যেন আমাদের বিশ্বাসযোগ্য হয়—"যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতি খণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্-বর্ণনীয়ম্।" এইটেই আসল কথা। প্রতীতি অর্থ হোল মৌলিক বৃত্তিকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা। এইটে না হলে কাব্য হয়ে যায় অবাস্তব।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও আমাদের এই অভিজ্ঞতাও আছে যে এক কালের সাহিত্য কালোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অপর কালে অবাস্তব বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। এহেন ক্ষেত্রে আমরা বাস্তবতা এবং অবাস্তবতা কথা দুইটি অত্যন্ত সাধারণ অর্থে ব্যবহার করি। রামায়ণ মহাভারতকে আজ কেউ বাস্তববাদী রচনা বলবেন না। কিম্বা মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল কাব্য" যেখানে বস্তু রসের প্রাবল্য, তাকেও আধুনিক অর্থে কেউ বাস্তববাদী সাহিত্য বলবেন না। এমন কি শরৎচন্দ্র এক সময় বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তিনিও আজ রোম্যান্টিক বলে চিহ্নিত হয়েছেন। কেন এমনটি হয়? কারণ প্রতিকালে যুগে কতকগুলো ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করে বেড়ায়। যেহেতু সাহিত্য কালবাহিত সেই জন্য যে সাহিত্য যে কালের রচনা সেই কালের আনুগত্য আমরা দাবী করি। যে সাহিত্যে ঐ কালানুগত্য প্রতিফলিত হয় তার প্রতি আমাদের স্বাভাবিক ভাবে মানসিক সমর্থন এসে পড়ে। এই সহজ-গ্রাহ্যত্বের জন্যেই সেই রচনা বাস্তব বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত বাস্তবতা ঝরে পড়ে। এইটে একান্ত ভাবে সঞ্চারিভাব সৃষ্ট। এতে কাব্যের আস্বাদনে হেরফের ঘটলেও, তাই কাব্যবিচারের অভ্রান্ত মানদণ্ড কখনই নয়। কারণ এই বস্তু কেবল রূপ রঙ পাল্টায়। আমরা এইটেও জানি মহৎ সৃষ্টি কেবলমাত্র কালবাহিত নয়,—কালোত্তীর্ণও বটে। তাই সাহিত্যের একদিকে আছে কালানুগত্য অপর দিকে নিত্যসত্য। কালানুগত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে খণ্ডিত বাস্তব বা স্থূল অর্থে বাস্তব হতে পারে, কিন্তু নিত্যসত্য অধিকতর বাস্তব রসের সত্য—শাশ্বত বস্তু। ঐ বাস্তবতার নিরিখে সাহিত্যের বাস্তবতা কথাটি বিচার্য। এখানে যদি ত্রুটি থাকে তবে তাকে বাস্তব বলব না।

আমরা এখন পূর্বের সূত্রধরে বলতে পারি লৌকিক জীবনে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তব যেমন নেই, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাল নিরপেক্ষ বাস্তবতা নেই। এইজন্য. সাহিত্য পাঠের কালে যে কালে তা রচিত তার দ্বারা ভাবিত হতে হবে। বোধ করি এই কারণে ভার্জিনিয়া উলফ "How should one read a book" প্রবন্ধে বলেছেন,—"Do not dictate to your author. Try to become him" আধুনিক সমাজ সচেতন মন নিয়ে পুরাণের গল্প আমাদের কাছে অবাস্তব বা আধুনিক রুচির কাছে incestuous মনে হতে পারে, যদিও সেখানে জীবনসত্যের দুর্জয় ইঙ্গিত রয়েছে। তাই তাকে আস্বাদন করতে হোলে পুরাণকারের সামীপ্য অর্জন করতে হবে—রস সত্যের দৃষ্টিতে তাকে দেখতে হবে। তাহলে বহু অবান্তর প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে বস্তুবাদীদের ভাষ্য সামান্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কেননা তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা আরও স্পষ্ট হবে। বস্তুতান্ত্রিকতার অর্থ বহির্জগতের জড় বস্তুর অবস্থান গত প্রভাব। কালমার্কসের মতবাদের ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা। বস্তুতান্ত্রিকতা বিশেষ করে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর সাহিত্যিকতা নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি এবং সামাজিক প্রয়োজনের সংঘাত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো নির্ধারণ করে, এই সমাজ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, শিল্পসৃষ্টি তারই উপজাত ফল। "শিল্প, সাহিত্য, কাব্য এক কথায় সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কাঠামো।" ("Art and literature are the superstructure built on a definite economic basis of Society.") এই সমাজ ব্যবস্থার মানসিক উত্তরণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এই যুক্তি স্বীকার করে নিলে কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমতঃ একই যুগের সাহিত্যে বৈচিত্র্য কেন দেখা যায়? দ্বিতীয়তঃ একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে ব্যালজাক এবং ভিক্টর হ্যুগো সাহিত্য রচনা করলেন। অথচ এই মতবাদের ধারকদের কাছে ব্যালজাক সমাজ সচেতন শিল্পী, হ্যুগো নন কেন? বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে তার আলোকে সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে কড্‌ওয়েল বলেছেন,—"There is no classless art except Communist art and that is not yet born, and class art to-day unless it is proletarian, can only be the art of a dying class."—মন্তব্য খুবই মুখরোচক এবং চটকদারী। কিন্তু প্রশ্ন থেকে

যায়,—মুমূর্ষু সমাজ যদি মুমূর্ষু শিল্পীর জন্ম দেয় তবে মুমূর্ষু সমালোচকের জন্ম দেয় নি এমন কথা বলা যায় কি ? কড ওয়েল তো dying class-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ঐ মন্তব্যের সারবত্তা নেই। সহজ কথায় স্থূল বস্তুতান্ত্রিকতা দিয়ে সাহিত্য বিচার চলে না। সাহিত্যের বিচার রসের কষ্টিপাথরেই করতে হবে।

রসকে কষ্টিপাথর ধরে নিলে বলতেই হবে অনুভূতিই হচ্ছে রস। এর থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করতে হবে অনুভবের সত্য, সাহিত্যের সত্য এবং তা বাস্তব। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক,—

> "I lov'd Ophelia : forty thousand brothers
> Could not with all their quantity of love
> Make up my sum"

ওফিলিয়ার প্রতি প্রেমের গভীরতা প্রকাশার্থে হ্যামলেট ঐ কথাগুলো বলেছেন। চল্লিশহাজার ভাই-এর ভালোবাসা ওজন করে দেখবার বস্তু নয়। তবুও ঐ কথা অবাস্তব নয়, কেননা ওতে আবেগের সত্য—অনুভূতির সত্য দেশকালাতিশায়ী রূপ পেয়েছে, ওর ব্যবহারিক সত্যতা না থাকলেও কিছু এসে যায় না—ও যে চিরকালের সত্য। সেক্সপীয়র বিশেষ নাটকীয় ঘটনা-সন্ধিতে বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতা সম্পন্ন মানবচরিত্রের ঘাত-সংঘাত আবেগ চিন্তাকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তাকে আপন ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ ভাবে ছন্দে, ভাষায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। এবং তার এমনই মহিমা যে আমরা তাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। কাব্যের এই লোকোত্তরতার জন্যই ব্রাডলি বলেছেন,···the pursuit of poetry for its own sake is the pursuit both of truth and goodness··· wherever the imagination satisfied, there if we had a knowledge we have not, we should discover no idle fancy but the image of truth."—ব্রাডলি কথিত "image of truth"-এর সত্য অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে আছে বলেই কাব্য আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে উঠে—আমাদের আনন্দ দেয়। "idle fancy" আপাত প্রতীয়মান আনন্দের কুহক জাল সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তা শাশ্বত নয়। তাই সাহিত্যের বাস্তবতা অনুভব-বেদ্য।

॥ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনা ॥

"I can go out of myself entirely and enter into the minds and feeling of others." —John Keats

'সাহিত্য' কথাটির অর্থ হোল অপরের সঙ্গে সহিতত্ব উপলব্ধি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের বোধ নানাপ্রকার স্বার্থের সংঘাতে আবিল হয়ে পড়ে, প্রয়োজনের সংকীর্ণতায় তা খণ্ডিত হয়ে পড়ে, নিজের ভালোলাগা, মন্দলাগার ছোট বাটখারায় জগৎ ও জীবনকে ওজন করতে বসে বৃহত্তর এবং মহত্তর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তাই সহিতত্বেপূর্ণ উপলব্ধি ব্যবহারিক জীবনে সম্ভব হয় না। অথচ মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অপর হৃদয়ের সঙ্গে মিলনের আবেগে বেদনাদীর্ণ। এই হৃদয়ের মিলনের ক্ষেত্র হোল সাহিত্য। কেননা সেখানে হৃদয়ের বেগবান অভিজ্ঞতা অপর হৃদয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিত্তবৃত্তির সহৃদয়তার বশে রসোপলব্ধির ঐক্য অনুভব করে। কারণ সাহিত্যের জগৎ ভাবের, সাহিত্যের জগৎ রসের, সাহিত্যের জগৎ অলৌকিক —এই জগৎ পরিমিতি বোধের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়।

সাহিত্যের জগৎ লোকোত্তর, এই জগৎ ভাবের—এইটে কবির সৃষ্টি। এখন প্রশ্ন হোল কবিশিল্পী কোন্ উপায়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, আপন হৃদয়ের বেগবান অভিজ্ঞতাকে অপরের হৃদয়ে পৌঁছিয়ে দেন, এই সৃষ্টির মূল রহস্য কোথায়, এই বিষয় রবীন্দ্রনাথের অনুধ্যান কি তাই এখন আলোচনা করব।

সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুইটি মূল উপাদান সর্বজন স্বীকৃত। একটি Subject অর্থাৎ স্রষ্টা অপরটি Object অর্থাৎ জীবন ও জগৎ। স্রষ্টার আছে নিজস্ব মনোভঙ্গী আর বিষয়ের আছে আপন অভিব্যক্তির স্বতন্ত্রতা। একটিকে বলা যেতে পারে ভাব, অপরটিকে জ্ঞান। ঐ মনোভঙ্গী বিশেষ ভাবুকতার বাহন—বস্তুর স্বাতন্ত্র্য সেখানে ভাবের বন্যাস্রোতে বিলীয়মান অর্থাৎ ঐ স্রোতধারায় স্নান করে উঠে। এর ফলে কি হয়? বস্তুর ব্যবহারিক তথা স্থূল বাস্তবিক সত্তা স্রষ্টার ভাবদৃষ্টিতে জারিত হয়ে রূপান্তরিত হয় ভাবসত্তায় বা রসসত্তায়—সৃষ্টি হয় অনন্যপূর্ব ভাবের জগৎ। বস্তুর একক অস্তিত্ব স্রষ্টার গভীর অন্তর্দৃষ্টির সামনে আপন মহিমায় স্বপ্রকাশ থেকেও নিখিলের ব্যঞ্জনার সঙ্গে নিত্যকালের সামগ্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করে চলেছে। অর্থাৎ শিল্পীর সৃষ্টি বিশিষ্ট হয়েও নির্বিশেষ হয়ে উঠে। প্রকৃতি সর্বক্ষণ এক বহিরাবরণ সৃষ্টি ক'রে শিল্পীর দৃষ্টিকে বাহ্য ঔজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত করতে চায় ঐ একের

অখণ্ডতাকে সংগোপনে রক্ষা করে চলতে চায়। যিনি এই ছলনা ধরে ফেলেন তাঁর দৃষ্টিতে তথ্য সত্যে রূপান্তরিত হয়ে রসসৃষ্টি করে। ভাব আপনার কৌতূহল মেটাতে পথ খুঁজে ফিরছে যার সম্মুখে ঐ বাতাবরণ খুলে গিয়েছে তার ভাবদৃষ্টি সার্থক পরিণতিতে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর সৃষ্টি শিল্প সাফল্যে কালোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদের সূত্র ধরে বলতে পারি যে, যেহেতু ভাবের জগৎ মনের সৃষ্টি সেই জন্য মানুষ নিছক প্রাকৃতিক নয়,—মানসিকও বটে। আমাদের শাস্ত্রেও বলে যে মানুষ মানস জীবনে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে সৃষ্টির ভিতরে। 'সৃষ্টি' কথাটির দ্বারা আমরা এখানে ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ তার কীর্তিমূলক সব কাজ কর্মকে বোঝাচ্ছি। সাহিত্য সৃষ্টির মূলধন মানস জগৎ। বিশ্বের উপরে অহরহ আপন মনের রঙ ফলিয়ে শিল্পী একটি বিশ্বসৃষ্টি করেন, একে বলে "creating his own world"--এই সৃষ্টিকে রচনা নৈপুণ্যের গুণে, সাধারণী-কৃতির মাধ্যমে যতখানি সহৃদয়ের বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন ততখানি তার শিল্প সাফল্য। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যে বলেছেন,—"জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।" "জগতের উপর মনের কারখানা" কথাটির দ্বারা কবি স্বীকার করেছেন, মন প্রাকৃতিক বস্তুকে মানসিক করে নেয় এবং "মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি"—বাক্যের দ্বারা বুঝিয়েছেন নিজের বস্তুকে সকলের করে প্রকাশ করা। এর ফলে সাহিত্যের ভিতরে সহিতত্ত্ব এসে যায়,—এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের সম্মিলন ঘটে। এই যোগ অনুভূতির যোগ, ভাবের যোগ। ভারতীয় রসবেত্তাদের চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রসচেতনার ঐক্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রাচীন আচার্যেরাও বলেছেন যে, স্রষ্টা যা উপলব্ধি করেন তাকেই কবিব্যাপারের দ্বারা সাধারণীকৃত করে রসচর্বণার সামগ্রী করে তোলেন। এখানে মৌলিক চিত্তবৃত্তির সাধারণ ভূমিতে উত্তরণ ঘটে। আবার রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—"ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিত কলা।" এইভাবে নিজের করার ভিতরে যেমন বিশেষত্ব আছে তেমনই সকলের করবার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। এই কারণে সৃষ্টির ভিতরে বৈচিত্র্য এসেছে—একই বস্তুর বর্ণনায় শিল্পীভেদে রসরূপে ভেদ ঘটেছে। এইটে যেমন সত্যিকথা যে শিল্পীর দৃষ্টি রূপদ্রোহী নয়,—রূপ-রসিক, তেমনই এইটেও সত্যি যে শিল্পের জগৎ বিশেষের জগৎ—নির্বিশেষের রাজ্য নয়, যদিও সব কিছু রস নামক বস্তুর অধীন হয়ে নির্বিশেষ হয়ে উঠে। রস কবিব্যাপারের দ্বারা শবলিত হয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠে। এইটে বহুর মধ্যে একককে বিলীন করে দেওয়ার বারোয়ারী

ব্যাপার নয়—এইটে প্রকৃতির সেই বহুর এলাকা থেকে প্রত্যেকটি বস্তুকে এক এক করে রূপলোকে প্রবেশ করানো। তাই শিল্প সৃষ্টি সংযম সাপেক্ষ। এই কারণে কবি বলেছেন,—"কলাবান গুণীরা বস্তুতঃ যেখানে গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না; সেখানে চিত্তের সাধন ও সংযম আছেই"—কথাটির তাৎপর্য হোল এই যে, বস্তুর আসল রূপকে আবৃত ক'রে ফেলে, রূপের প্রাণকেন্দ্র থেকে দৃষ্টিকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় রূপের বহির্সীমানার প্রান্তে, এমন অনেক চোখ ভোলানো বস্তু বাদ দিয়ে দিতে হয়। এই বাহুল্য বর্জনের জন্য সংযমের কঠিন সাধনা করতে হয় শিল্পীকে। তাই শিল্পীর সংযম কথাটির অর্থ দাঁড়ালো এই যে, নিষ্প্রয়োজনের বহু কিছুকে বাদ দিয়ে আসলকে ধরা অর্থাৎ বস্তুর সত্তাকে স্পর্শ করা। যদি নিষ্প্রয়োজনকে বাদ না দেওয়া যায়, তাহলে চারিদিকে ছড়ানো বহু রঙীন জিনিসে মন আবদ্ধ হয়ে পড়ে, বস্তুর প্রাণকে উপলব্ধি করা যায় না, তথা অবান্তরকে বাদ না দিলে সৌন্দর্যের উপলব্ধি ঘটে না। এইজন্যই বাহুল্যকে বর্জন করে সহজ হওয়ার সাধনা শিল্পীর পক্ষে সব চাইতে কঠিন ব্যাপার। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বস্তু ও ঘটনার প্রাণের রূপকে শিল্পী ফুটিয়ে তুলতে পারেন। নতুবা রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত উতঙ্কের মতো মহিষীর দেখা মেলে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য হেতু সৌন্দর্যের উপর দস্যুবৃত্তি প্রাধান্য পায়। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। সৌন্দর্যের আবেদন প্রাথমিক স্তরে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে কিন্তু তা ইন্দ্রিয়ের দেউড়ি পেরিয়ে মানসভোগের পর্যায় উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাতে পূর্ণতা আসে না—তা কলুষমুক্ত হয় না। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম যেহেতু চঞ্চলতা সেইজন্য তা এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে ধাবিত হয়, বারংবার সৌন্দর্য ধ্যান খণ্ডিত হয়। যথার্থ সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রলোকে—সে একটি ধ্যানজ মূর্তি, মানসিক শুচি শুদ্ধতার চরমতম পর্যায়ে তার অধিষ্ঠান। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ের অশান্তি আর যখনই তা ইন্দ্রিয়ের দেউড়ি পেরিয়ে গেল তখন প্রৈতির প্রশান্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ। লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।" তিনি আরও বলেছেন,—"বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন তিনি আমাদের সম্মুখে আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইবে না।" রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায়ও এই ভাব প্রকাশ করেছেন,—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।

*　　　*　　　*

দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী।"

অপর দিকে,—

"একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত গগনে।"

প্রথমটি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ এবং তা চঞ্চল। দ্বিতীয়টি ধ্যানজ প্রশান্ত রূপ। ঐটে "অন্তঃপুরের সতীলক্ষ্মী।" এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, স্বর্ণাভ-সুষমার মূর্ত প্রতীক কাঞ্চন প্রভামণ্ডিতা নারী রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির অনুবেদ্য স্বীকৃতির তিলোত্তমা। এবং এই নারী-কামনার বাহুবন্ধনে ধরা দেয় নি। নন্দিনী রাজা বা রঞ্জনের স্থূল ইন্দ্রিয় বিলাসের সামগ্রী নয়। আবার 'রাজা' নাটকে দেখালেন যে রানী সুদর্শনা নিছক দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির পথে সুন্দরকে খুঁজে পেতে গিয়ে নিজের জীবনে বয়ে এনেছেন অশান্তি আর অপর হৃদয়ের যদি কোনও পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে তা হল কুশ্রীতা। কিন্তু যেদিন তা ইন্দ্রিয়াতীত হল সেদিন লাভ করেছেন প্রশান্তি। পূর্বের কথাতেই ফিরে আসি; সৌন্দর্য রূপলোকের সরণী ধরে রূপাতীত হয়ে যায়। উর্বশীকে উপলব্ধি করা যায়, বাস্তবে পাওয়া যায় না।

এখন আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সৌন্দর্য অন্তরের সত্যোপলব্ধিজাত। কাব্য সাহিত্য ঐ সত্যোপলব্ধির ফল-পরিণাম। কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। কাজেই যা আনন্দ দেয় তাই সুন্দর। ঐ আনন্দের মূলে আছে অন্তর বাইরের ঐক্যবোধ। ঐক্যবোধ অর্থ স্থায়ী ভাব যা কাব্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে এবং যা সহৃদয়ের চিত্তে রয়েছে, সেই দু'য়ের একীকরণ। কবি বলেছেন, বহির্জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন রয়েছে একের অস্তিত্ব, তেমনই ঐ একের অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের অন্তরে। ব্যবহারিক জীবনে ঐ একের মিলন নানাভাবে বাধিত হয়। কাব্যে, সাহিত্যে এতদুভয়ের মিলন সাধন হয়। এই দুয়ের মিলনতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্য বা দুঃশাসনের রক্তপানের দৃশ্যর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটি নিশ্চয় আনন্দকর নয়। অনুভূতিটা ঘনীভূত হলেই আনন্দ পাই। ঐ দৃশ্য দুইটিতে যথাক্রমে, ঈর্ষা, নীচতা, ঘৃণা এবং পরেরটিতে প্রতিবিধিৎসা, ক্রোধ, বীভৎসতা প্রভৃতি বৃত্তি-গুলোর অভিব্যক্তি ঘটেছে। আর ঐ বৃত্তি-গুলোর* সত্য-অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা কাব্য বর্ণিত বৃত্তিগুলোর সঙ্গে ঐক্য বোধ করি, ফলে ঐ বৃত্তির ভাবরাজির স্পষ্ট আস্বাদন ঘটে

এবং তা আনন্দ দান করে। ঐ অন্তর্গূঢ় ঐক্যের সূত্রে আমরা বাহ্যবস্তুকে সুন্দর দেখি। কেননা, সৌন্দর্য হোল সুষমা বা একের Idea-র বিকাশমাত্র। কবি বলেছেন,—"অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্টস্‌কে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার-আয়তনের কতগুলি পাঁপড়ি, বোঁটা, তাকে ঘিরে আছে সবুজপাতা। এই সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব; তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য; যে আমার ব্যক্তিপুরুষ।...গোলাপের আকারে, আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত একককে। সেই জন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।" রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জড়িয়ে এবং সমস্ত ছাড়িয়ে যে ঐক্যতত্ত্বকে 'সুন্দর' বলেছেন, আচার্য আনন্দবর্দ্ধন তাকে রমণীদেহের লাবণ্য বলেছেন। এই বস্তুটি তথ্যের মধ্যে নেই—আছে আমাদের অনুভূতিতে। রবীন্দ্রনাথ যাকে "ব্যক্তিপুরুষ" বললেন তার দ্বারা আমরা অস্তিত্বকে উপলব্ধি করি—তাই ভাবান্তরে "অস্মিতাসূচক।"

কবি লক্ষ্য করেছেন যে বাস্তব জীবনে 'আমি আছি' এই বোধ অস্পষ্ট হয়ে থাকে। তাই তার উপলব্ধি তীব্র এবং পরিচ্ছন্নভাবে ঘটে না। সাহিত্যে অস্তিত্ব উপলব্ধির বাধা স্বরূপ বাতাবরণ ভেঙে যায়। কীটস্ একে বলেছেন—"disagreables evaporate।" এই কথা আচার্য অভিনবগুপ্তও বলেছেন। এর ফলে আমরা সাধারণ মিলনভূমিতে উত্তীর্ণ হই, সার্বজনীন ঐক্যের প্রসাদগুণে আবিষ্ট হই।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তথ্যকে আশ্রয় করে সত্যের স্বাদ দেওয়াই সাহিত্যের ধর্ম। সত্যই আনন্দময়, সত্যই সুন্দর। তাই কীটস বলেছেন—"Truth is beauty, beauty truth।" রবীন্দ্রনাথের কথায়,—"যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ এই জন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই সাহিত্যের প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ অসীমের স্বাদ।" অর্থাৎ আনন্দ সৌন্দর্য বাইরেকার বস্তুতে নেই। আছে আন্তর রসিকতায়। রস অনুভূতি-সাপেক্ষ। তাই কবি বললেন,—"অনুভূতির বাইরে রসের কোনও অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রসবোধ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের

চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না।" এই হোল কাব্যকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গের প্রকাশ। এখানে রবীন্দ্রনাথ কথিত 'তথ্য' হোল বাচ্য এবং "অনির্বচনীয় ভাবে তাকে অতিক্রম করে" হোল ব্যঙ্গ। এই সূত্রে বলে রাখা ভাল, বিশ্বের যে কোনো বস্তু সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গৃহীত হতে পারে, কেবল বিচার করবার বিষয় হোল যে তা সৃষ্টি গৌরবে সার্থক হয়ে আমাদের রসচেতনাকে উদ্বোধিত করল কিনা —তার প্রকাশ অস্মিতাসূচক কিনা; তা যদি হয় তবে তাকে সত্য বলে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। সাহিত্যের সত্য ব্যবহারিক বাস্তবতার মাপকাঠিতে বিচার্য নয়—বিচার্য হোল রসের মাপকাঠিতে। হোক না কেন তা ডাষ্টবিনের কথা, যৌন ব্যভিচারের কথা, চাই রাজকন্যা, দৈত্যপুরীর কথা। সাহিত্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতা সব কিছুর বিচার হবে রসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে। রসসত্যের মানদণ্ডে সাহিত্যে সত্য মেনে নিতেই হবে।

এখন আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সাহিত্যের সৃষ্টি ব্যক্তিগত পক্ষপাতে এবং তার সার্থকতা ব্যক্তি নিরপেক্ষতায়। শিল্পী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ক্ষণিকের অনুভূতিকে বিশ্বজনের সামগ্রী করে প্রকাশ করেন, তাকে নিত্যতা দান করেন। বিশ্বজনের সামগ্রীতে রূপান্তরিত করার মূলে রয়েছে নির্লিপ্ততা। একে বলা হয়,—'Psychic distance'। রোজার ফ্রাই বলেছেন,—"Art demands the complete detachment from the meaning and implication of appearances.।" রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে, জগৎ ব্যাপারকে ব্যক্তিগত আসক্তি থেকে মুক্ত করে—তদ্গত ভাবে নিরাসক্ত চিত্তে দেখাই যথার্থ দেখা এবং তাই সাহিত্যের দৃষ্টি। কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে—আলঙ্কারিকেরা বলেছেন যে রসাত্মক বাক্যই হোল কাব্য। রসের স্বরূপ কি? এর ব্যাখ্যা এখানে বিস্তৃত ভাবে না করে, মোটামুটিভাবে বলতে পারি যে স্থায়িভাবের অভিব্যক্তি হোল রস, তা অলৌকিক তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত অথচ ব্যক্তিস্বভাব বর্জিত। লৌকিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা হয় বিষয়-বস্তুর প্রতি উদাসীন থাকি, নয় প্রবলভাবে আচ্ছন্ন হই তাই সেই অভিজ্ঞতা-খণ্ডিত হয়ে যায়—চর্বণার বিষয় হয় না। এর মূলে থাকে ব্যক্তিজীবনের লাভক্ষতির নানা প্রশ্ন। রস যেহেতু অলৌকিক তাই আমাদের স্থূল লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তার কোনও যোগ থাকে না লৌকিক কার্য কারণ নিরপেক্ষ ভাবে মানসিক চর্বণার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এর স্বাদ স্বগত এবং পরগত। এই কারণে ওথেলো ভাঁড়ু দত্ত যে কোনও ব্যক্তির অনুভূতির সাহচর্য করতে আমাদের বাধে না। এই অনুভূতির ঐক্য বিধানই হোল সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ রসকে কাব্যের চরম এবং শেষ কথা বলে স্বীকার করেছেন। এবং এই সূত্রে তিনি বলেছেন কাব্যের লক্ষ্য আনন্দ দান। এর বেশি কিছু নয়। যদি কেউ এর থেকে উপদেশ পেতে চায়, নীতিশিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তবে সে তা পেতে পারে। কিন্তু কবির লক্ষ্য কিছু প্রচার নয়। এইটে আমরাও স্বীকার করি। কারণ কোনও কিছুর প্রচার অর্থ হোল সেই বিষয় সম্পর্কে মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করা। আর যা মিথ্যা তা কখনও শাশ্বত হতে পারে না। অথচ সাহিত্য শাশ্বত, যেহেতু তা সত্যের আনন্দময় অভিব্যক্তি।

এখন বিচার্য হোল এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের যোগসাধন কোন উপায়ে স্রষ্টা করেন। যার ফলে সাহিত্য সহৃদয়ের হৃদয়-সংবেদ্য হয়ে উঠে। এই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বক্তব্য রেখেছেন তাই আমরা এখন আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"সাহিত্যের বিচারের সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।" এই দুইটি বিষয় পরস্পর গূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। "স্থায়ী আকারে ব্যক্ত" করবার সার্থকতার উপর কবির উদ্দিষ্ট রস সংবেদনা অনেকখানি নির্ভর করে। এর উদাহরণ হিসেবে বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার পার্থক্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রকাশের দুর্বলতার জন্য বিহারীলালের কাব্যের communication সার্থক নয় আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভাব ও ভঙ্গীর সমতা থাকায় তার আবেদন সার্থক। ভাবকে রূপে ব্যক্ত করবার কাজে আছে ছন্দ ও অলঙ্কার। এরা হোল ভাবের অপরিহার্য প্রসাধন। ছন্দ ও অলঙ্কার শব্দের সীমাবদ্ধতাকে ভাঙ্গে। ছন্দের ভিতরে আছে গতি। ঐ গতি পাঠকচিত্তে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করে কল্পলোকে ঢেউ তুলে দেয়—চিত্ত স্বাধীনলোকের অভিসারী হয়। ছন্দের স্পর্শে সাধারণ কথা অসাধারণ হয়ে উঠে, ভাষার ভিতরে ভাষাতীতকে অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নবসুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।"

ঐ ছন্দের আবির্ভাব ঘটে ভাবাবেগের গভীরতা থেকে, কথায় যাকে বলা যায় না সে রূপলাভ করে সুরে; এই জন্যে বলা হয়,—"To see deeply enough is to see musically!" ছন্দোময় চলমানতার মধ্যে সত্যের আনন্দমূর্তি অভিব্যক্ত হয়। ছন্দের বন্ধনে সংযত হওয়াতেই বিদ্রোহী অণু-পরমাণু নৃত্যপরা হয়ে উঠেছে—

জগৎ সুন্দর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন যে, কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ সুপ্রত্যক্ষ গদ্যের ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন। তাই গদ্য যেখানে সাহিত্য পদবাচ্য হয়, সেখানে তা ছন্দের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দপতন বাঁচিয়ে "শিখতে হয় তার গতি অবগতি।" তাই রূপসৃষ্টি ক্ষেত্রে ছন্দের মহিমা স্বীকার করতেই হবে।

কাব্যে শিল্পে আমরা অনুভূতির সত্যকে অভিব্যক্ত হতে দেখি। আমরা বিশেষ মুহূর্তে যা অনুভব করি তা যে মিথ্যা নয়, কল্পনা নয় তাই বোঝাবার জন্য, তাকে রূপ দেওয়ার জন্য অলঙ্কারের আশ্রয় নিই। রূপক উপমাদি অলঙ্কার নৈর্বস্তুক ভাবকে বস্তুগ্রাহ্য করে তোলে। আবেগের নৈষ্ঠিকতা প্রকাশ করে। মা যেমন করে সাজান সন্তানকে, বাসর ঘর যেমন করে সাজানো হয় ফুল দিয়ে, সাহিত্যের অলঙ্করণও তেমনই। আবেগের গভীরতা প্রকাশের ব্যাকুলতা থেকে অলঙ্করণ যে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে সে কথা কড্‌ওয়েলও স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়"—বাক্যে রূপক ব্যবহার ব্যাকুলতার ভাবকে, হৃদয়ের আকর্ষণের ভাবকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। তাই বলা যেতে পারে ভাবকে বস্তুগ্রাহ্য করে তুলবার জন্য সাহিত্যে চিত্র ও সংগীতের আশ্রয় নিতে হয়। চিত্র হোল রূপকল্প এবং সঙ্গীত হোল সুর। এটাও তো আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা যে কাঠখোট্টা গদ্যময় জীবনেও আমরা উপমা রূপক ছাড়া ভাব প্রকাশ করতে পারি না, যেমন বলা যেতে পারে, "সাঁড়াশি আক্রমণ", "আইনের বেড়ি", "মৃত্যুর হাতছানি", "রোগের প্রহার" ইত্যাদি। কবি শিল্পীর ক্ষেত্রে এই বস্তুই প্রকাশের নিটোলতায় রূপসৃষ্টি করে। সেখানে ভাব ও ভাষার সারূপ্য সাধন ঘটে। তাই বলা যেতে পারে ভাব ও ভাষার সারূপ্য সাধন যত পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে সাহিত্যের গৌরব সেই অনুপাতে সার্থক হয়ে উঠে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাব ও ভঙ্গী অন্যোন্যসাপেক্ষ বা তুল্যস্কন্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা।"

রূপতত্ত্ব সম্পর্কে কবির মন্তব্যের গূঢ়ার্থ হোল এই যে ভাব যেখানে নির্ভেজাল ও গভীর সেখানে তা প্রকাশের বাহন স্বাভাবিক ভাবে আবিষ্কার করে নেয়—তার জন্য পৃথক যত্নের প্রয়োজন হয় না। ভাব ও ভাষা সেখানে পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো অবিনাবদ্ধ ভাবে বিরাজ করে। ভাব ও ভাষার এই ধরণের সৌহৃদ্য প্রাচীন ভারতীয় রসশাস্ত্রীরা স্বীকার করেছেন। তাঁদের অভিমত এবং কবি এলিয়টের অভিমত প্রথম অধ্যায়ে (সাহিত্যের সংজ্ঞা) আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হোল। আমরা এখানে কেবল দার্শনিক ক্রোচের অভিমত উল্লেখ করব। তাতেও দেখা যাবে যে আচার্য কুন্তক কবি এলিয়ট,

সমালোচক এ্যাবারকোম্বি, দার্শনিক ক্রোচে এবং রবীন্দ্রনাথ কাব্য ভাবকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করবার উপায়কে যে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর মৌলিক ঐক্য ধরা পড়বে,—ক্রোচে বলেছেন,—

"Thought, musical fancy, pictorial image, did not indeed exist without expression, they did not exist at all, previous to the formation of this expressive state of the spirit. To believe in this pre-existence is simplicnty, if it be simple to have faith in those impotent poets, painters, musicians, who always have their heads full of poetic pictorial, musical creations and only fail to translate them into external form, either because as they say, they are impatient of expression or because technique is not sufficiently advanced to afford sufficient means for expression"

[The essence of aesthetic p-43
Benedetto Croce.]

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভাবের কোনও দেহ নেই, শব্দেরও রূপ নেই। কবিদৃষ্টিতে এই দুয়ের চকিত মিলন ঘটে এবং রূপসৃষ্টি হয়। ঐ রূপ ভাবকে বস্তুগ্রাহ্য করেও বস্তুর অতীত করে দেয় তেমনই ঐ ভাবের স্পর্শে শব্দ রূপময় হয়ে উঠে। একেই বলেছি ভাব ও ভাষার সারূপ্য সাধন। এক থেকে অপরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ঐ রূপসৃষ্টির সহায়ক হোল সাজসজ্জা, ইশারা ইঙ্গিত, ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদি। এরাই রসকে আকর্ষণ করে আনে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সাহিত্যের জগতে রূপসৃষ্টির মূল্য অসামান্য। তিনি বলেছেন,—"আনন্দমঠে সত্যানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণা করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে প্রশ্ন করব না; আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের দিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয়ে সুপ্রত্যক্ষ কোনো একটি চরিত্ররূপ জাগ্রত করা হ'ল কি না।" তা যদি হয় তবে কবিত্ব সার্থক, আর না হলে, নীরব কবিত্বের কোনও মূল্য নেই। এই হল কবির প্রকাশতত্ত্ব। এই প্রকাশে 'আমি আছি' সমস্তের ভিতরে, সমস্ত আছে আমার ভিতরে—চৈতন্যের এইরূপ সম্প্রসারণে আপন অস্তিত্ব অনুভব করে ধন্য হই। রূপ আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়েও নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। রূপের বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠে লেখকের style এবং তা তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যোতনা করে। একেই বলা হয়েছে—"...feeling and emotion are particular where-as thought is general."

॥ স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব ॥

সাহিত্য-তত্ত্বের বিচারে ভারতীয় রসবেত্তারা রসকেই প্রমাণ ধরেছেন। সাহিত্যে যাবতীয় উপকরণের সমবায় ঘটে রসকেই উদ্বোধিত করবার জন্য। রস নির্বিশেষে বস্তু। সব কিছুই তার অধীন। কিন্তু রসস্রষ্টা কবির ব্যক্তিত্বকে তাঁরা বিশ্লেষণ করেন নি। ডঃ সুশীল কুমার দে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রসকেই মূল ধরেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাব্যে কবি ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি ঘটে কি না তারও আলোচনা করেছেন। আমরা এখন এই বিষয়টির উপর সাধারণভাবে চোখ বুলিয়ে যাব।

পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচকেরা এই বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেছেন। মূলতঃ তাঁদের রসশাস্ত্র এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এতৎ সম্পর্কে তাঁদের মোটামুটি সিদ্ধান্ত হোল এই যে, সাহিত্যে শিল্পে কবির আত্মাবলুপ্তি ঘটে। নৈর্বক্তিকতাই শিল্পীর মূল ধর্ম। আত্মাবলুপ্তির এই শক্তিকে কীটস বলেছেন,—"Negative Capability"। কীটস একটি চিঠিতে লিখেছেন,—"And at once it struck me what quality went to form a man of achievement, especially in literature, and which Shakespeare possessed so enormously—I mean Negative Capability, that is when a man is capable of being in uncertainties mysterious doubts without any irritable reaching after fact or reason."—এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্সপীয়রকে "Myriad minded" বলে র‍্যালে অভিহিত করেছেন। কবি এলিয়ট মনে করেন শিল্পসৃষ্টি শিল্পীর আত্মভাবের পীড়ন থেকে মুক্তির উপায় মাত্র। একে এক ধরণের 'escapism' বলা যেতে পারে। কবি এলিয়টের ভাষায় 'escape from personality।" তাই তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা কবি ব্যক্তিত্ব বলতে তিনি কবির মানসিক জীবনকে বুঝিয়েছেন। যেখানে হৃদা-মনীষা-মনসার সম্মিলনে "আদত মানুষ"টি আছে, সেখানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, রুচি, বুদ্ধি সব কিছু গলে-মিশে একাকার হয়ে নিটোল ঐক্য লাভ করে। কবি একে কখনও "মর্মগত লেখক প্রবৃত্তি" কখনও "অমূর্ত ভাবশরীর" কখনও "আত্মপ্রকৃতি" কখনও 'ব্যক্তি স্বরূপ' 'ব্যক্তিপুরুষ" বলে অভিহিত করেছেন।' কবি বলেন 'মূল প্রকৃতি' সৃষ্টির উৎস।

কাজেই তার প্রকাশ সৃষ্টিতে ঘটে। তাই বলেছেন,—"যিনি যাই বলুন সেক্সপীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী সেক্সপীয়রকে পাওয়া যায়, সেখান থেকে তাঁর সমস্ত জীবনের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বিরাগ-অনুরাগ, বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে।" সকল বৈচিত্র্যের ঐক্যবিন্দুকে রবীন্দ্রনাথ কবি-ব্যক্তিত্ব বলেছেন। ঐ ব্যক্তিত্বকে বুদ্ধির বিশ্লেষণে ধরা যায় না, আমাদের খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমরা তার তল পাই না। সাহিত্যে চরিত্রাবলীর সঙ্গে আমাদের একীকরণ ঘটে, তা আমাদের উদার সমবেদনা-প্রসূত তৎসত্ত্বেও কোনো বিশেষ একটি চরিত্রের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত গড়ে উঠে। এইটে আমাদের বিশেষ মানস প্রবণতার ফল। অর্থাৎ আমাদের রুচি বুদ্ধির ফরমান অনুযায়ী সেই বিশেষ চরিত্রকে গ্রহণ করি এবং তদনুযায়ী লেখককে কেটেছেঁটে সেই চরিত্রের সঙ্গে একীকরণ করে নিই। ফলে প্রস্পেরোর জবানীতে সেক্সপীয়রকে বুঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যালিবান শাইলক প্রস্পেরো কারও প্রতি লেখকের বিশেষ পক্ষপাত নেই—সকলের মধ্যেই তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করেছেন। এই জন্যে তারা সকলে সজীব এবং প্রাণস্রোতে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন এরা সকলে সাহিত্য পিতার সন্তান, তাদের সঙ্গে নাট্যকারের যোগ জীবদেহের শোণিত প্রবাহের মতো। রবীন্দ্রনাথের কথায়,—"ভালো নাট্যকাব্যের লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাইরের মানব প্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।" তাই রবীন্দ্রনাথ কথিত কবি-ব্যক্তিত্ব অনুভূতি-বেদ্য। কবি আরও বলেছেন,—"মানুষের জীবনের কেন্দ্রগত এই সত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে, এইজন্য একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে।" আমরা পূর্বে দেখেছি সাহিত্যের সত্য বলতে কবি বুঝিয়েছেন, আমাদের ভিতরে যে ঐক্যবোধ আছে তার সূত্রে যখন বস্তুকে একাত্ম করে দেখি, তার মধ্যে যখন নিজেকে উপলব্ধি করি তখন তা হয়ে ওঠে সত্য। তাই সাহিত্যের সত্যকে লেখকের মর্মসত্য বলা যেতে পারে। কারণ আত্মার প্রসারতায় পারিপার্শ্বিককে আত্মসাৎ করবার ক্ষমতাকে বলা যেতে পারে বৃহৎ বক্তিত্ব বা "most comprehensive vision"। এই ব্যক্তিত্বের মুদ্রণ সাহিত্যে ঘটে।

এই সূত্রকে প্রলম্বিত করে বলা যেতে পারে একই আত্মা নানা খানা হয়ে শিল্পে শিল্পে ছড়িয়ে পড়ে। এ একরকম আত্মার লীলারস সম্ভোগ। রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রবন্ধে বলেছেন সাহিত্য সৃষ্টি হোল লীলা। কাজেই সাহিত্যে শিল্পী আত্মগোপন করেন না। আত্মাবলুপ্তি স্থূল অর্থে ঘটে না। বরঞ্চ তাঁর আত্মসম্প্রসারণ ঘটে এরই

সূত্রে আত্মোৎসর্জনের মুক্তি ঘটে। কবি বলেছেন,—"প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করতে গিয়েই অন্তর্নিহিত ঋণ শোধ করছে।" মানুষের ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য। মানবাত্মার ধর্ম প্রকাশশীলতা। এই প্রকাশ যেমন ব্যবহারিক জীবনের নানা কাজে দেখা যায়, সাহিত্যেও তেমনই দেখা যায়। তবে এতদুভয়ের মধ্যে গুণগত ভেদ আছে। মুমুক্ষার যে সহজ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে জন্মেছে সাহিত্যে তারই প্রকাশ ঘটে। মানুষের ভিতর যে মিলনাকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যপিপাসা রয়েছে তাকে সাহিত্যকর্মে মুক্তি দিয়ে আত্মপ্রকাশের বেদনাকে সার্থক করে তোলে। সেখানে তার অনুভূতি বেদ্য মর্মসত্যের অলক্ষ্য উপস্থিতি অবশ্যই থাকে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের শাস্ত্রে কবিকে বলেছে "দ্বিতীয় প্রজাপতি"। তিনি সকল খণ্ড বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে তাকে অতিক্রম করে যেখানে উপনীত হন সেইটে হল অখণ্ড এক বা মহৎ ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যে এই মহৎ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ঘটে। কবির দৃষ্টিতে লেখকের ব্যক্তিত্ব আরও গূঢ় অর্থপূর্ণ এবং ঐশ্বর্যময় এবং মানব জীবনের গূঢ়তর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব আলোচনার বিশেষ ভঙ্গীটি লক্ষ্য করবার মতো। এই আলোচনা আলঙ্কারিকদের নীরস বাদ-বিতণ্ডার অনুরূপ নয়। কবির প্রজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতার কাব্যিক সুষমা মণ্ডিত অভিব্যক্তি। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টিতে যে সুকোমল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে এই ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যক্তিত্বের স্পর্শপাতে প্রবন্ধাবলী সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি এলিয়েটের বক্তব্য মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন,—"There is no theory that is not a fragment carefully performed, of some autobiography"—তিনি এই মন্তব্য উদ্ধার করে বলেছেন ভ্যালেরীর প্রবন্ধ "form a part of his poetical works"—রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যেহেতু তিনি কবি সমালোচক—"Criticises his poetry with a view to creating poetry"—এখানেই তাত্ত্বিক এবং রসিকের দুর্লভ মিলন ঘটেছে। এই জিনিস আমাদের সাহিত্যে এক অনন্যপূর্ব, দুর্লভ সামগ্রী। এই একাঙ্গিক মিলনে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সাহিত্য দর্পণ—বিশ্বনাথ কবিরাজ।
(অধ্যাপক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

২। ধ্বন্যালোক বৃত্তি—আনন্দবর্দ্ধন

৩। ধ্বন্যালোক ও লোচন—আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত
(ডঃ সুবোধ রঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদিত।)

৪। অভিনব ভারতী (১ম ভাগ) ঐ অভিনব গুপ্ত।

৫। সাহিত্য মীমাংসা—অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

৬। কাব্য জিজ্ঞাসা—অধ্যাপক অতুল চন্দ্র গুপ্ত।

৭। অলঙ্কার চন্দ্রিকা—অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

৮। সাহিত্য বিচার—মোহিত লাল মজুমদার।

৯। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য।

১০। এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্য তত্ত্ব—ঐ

১১। শিল্প লিপি—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১২। রস সমীক্ষা—ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

১৩। সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪। সাহিত্যের পথে—ঐ

১৫। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন—ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী।

১৬। An sence of Aesthetic—Benedetto croce.

১৭। Principles of Literary criticism—Lascelles Abercrombie.

১৮। The epic.— ঐ

১৯। Aristotle's theory of poetry and fine arts.—S. H. Butcher

২০। Aristotle on the art of poetry.—Ingram Bywater.

২১। Shakespearean tragedy.—A. C. Bradley.

২২। A. B. C. of psychology.—C. K. Ogden.

২৩। Crisis in English poetry after Elliot.—V. De. S. Pinto.

২৪। The trend of the modern poetry.—Geoffrey Bullough.

২৫। The modern writer and his world.—G. S. Fraser

২৬। English literature of the 20th century.—A. S, coltins.

২৭। The Poetry and the poet—T. S. Elliot.

২৮। আনন্দ বৰ্দ্ধন ও রস প্রস্থান—অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

২৯। সাময়িক ও শাশ্বত—শ্রীরবি ঘোষ।